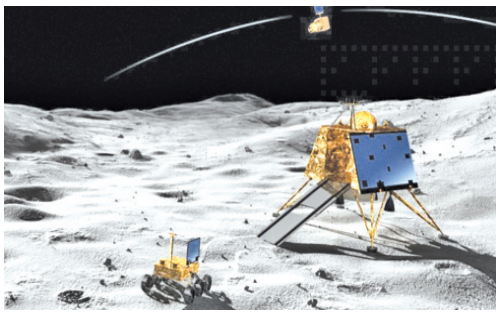

চন্দ্রযান-২

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

আমাজন অরণ্যের দাবানল

আগস্ট, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ চতুর্থ সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

মুখ্যমন্ত্রীকে বকেয়া দাবি নিয়ে চিঠি দিল সংগঠন

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৫৪/১৯ তারিখ ঃ ০২/০৯/২০১৯

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

মহাশয়া,

আমাদের সাথে ইতিপূর্বে গত ২৮ জুন, ২০১৯ সাক্ষাৎকারের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে একটি দাবির মীমাংসা ইতিমধ্যে হয়েছে। পাশাপাশি, আপনি অবগত আছেন যে, ইতিমধ্যে দেশের সব রাজ্যে মহার্ঘভাতাসহ বেতন কমিশন লাগু হওয়ায় কর্মচারীরা বর্দ্ধিত আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন। বর্তমানে আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক মহাশয়গণ, শিক্ষাকর্মী, বোর্ড, কর্পোরেশন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জীবনধারণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে ব্যাপক বেতন বৈষম্যজনিত কারণে আপনার কর্মচারী সমাজ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও চরম বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কর্মচারী সমাজের অসহনীয় সমস্যা বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু করা ও অন্যান্য অনার্জিত দাবিগুলি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পুনরায় আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্লক সম্মেলন

সারেঙ্গা ব্লক (বাঁকুড়া)

খড়িবাড়ী (দার্জিলিং)

জয়নগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

মেখলিগঞ্জ (কোচবিহার)

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ বর্ধমান শহরে। রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে সংগঠনের নিয়মাবলী অনুযায়ী একেবারে ব্লক স্তর থেকে শুরু হয়েছে সম্মেলনের প্রক্রিয়া। আগস্ট মাসেই রাজ্যের সব জেলায় অধিকাংশ ব্লকে সম্মেলন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে। ব্লক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নবনির্বাচিত ব্লক কমিটিগুলি একেবারে তৃণমূল স্তরে সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করছে। অধিকাংশ ব্লকে নবীন কর্মচারীরা এগিয়ে এসেছেন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সংগঠনের হাল ধরার জন্য। এবারের ব্লক সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, ১৯-২২ আগস্ট, ২০১৯ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক সফরের কর্মসূচী চলাকালীন বহু ব্লকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ব্লক সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন। এর ফলে যেমন সম্মেলনে উপস্থিত কর্মী-কর্মচারীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন, তেমনি একইভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সংগঠনের নিচের তলার কর্মীদের কাছ থেকে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন। ব্লক সম্মেলনের পর সেপ্টেম্বর মাস থেকেই শুরু হচ্ছে মহকুমা সম্মেলন। বিভিন্ন জেলার মহকুমা সম্মেলনেও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন এবং কর্মী সংগঠকদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। জেলার মহকুমা সম্মেলন চলাকালীনই

সপ্তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমুহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পুরোধা নেতৃত্ব তথা রাজ্যের শিক্ষক, কর্মচারী ও শ্রমিক-আন্দোলনের অন্যতম

ডঃ অসীম দাশগুপ্ত

পথিকৃত-সংগঠক প্রয়াত কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা বিগত ১৬ আগস্ট ২০১৯ কলকাতাস্থিত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন

অভীক মুখোপাধ্যায় (পুত্র)

কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী সুচেতা সাহা। স্মরণসভার সুচনায় কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক

প্রণব কর

প্রণব কর, রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব তপন দাশগুপ্ত, প্রদীপ গুপ্ত, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদীপ বিশ্বাস, জয়দেব দাশগুপ্ত, শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্ব সমর চক্রবর্তী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকদ্বয়, স্মরজিৎ রায়চৌধুরী ও অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং প্রয়াত কমরেডদের পরিবারের পক্ষে তাঁর স্ত্রী অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় ও পুত্র অভীক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মাল্যদানের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক দেবব্রত রায়।

শোক প্রস্তাব উত্থাপন করে অসিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন কর্মীদের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা আদায় করতে শিখিয়েছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। সাংসদ হিসাবেও সবসময়েই সোচ্চার ছিলেন সংসদে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী থেকে শিক্ষক মহাশয়দের সকলকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন যা আমাদের কাছে চির শিক্ষণীয়। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মতাদর্শের প্রতি সুগভীর আস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের সংগঠন মহীরূহে পরিণত হয়েছে। ষাট-সত্তরের দশকের উত্তাল পরিস্থিতি তাঁর জীবনেও অনিশ্চয়তা ডেকে এনেছিল। একসময়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন। বিপ্লবী চেতনার মানুষ ছিলেন যাঁর নেতৃত্ব আজও আমাদের পথ দেখায়। প্রণব কর বলেন অজয় মুখোপাধ্যায় অসম্ভব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। একদিকে নাটক, আবৃত্তি ও অন্যদিকে সাংগঠনিক দক্ষতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিভাবে করতে হয় তা তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। আন্দোলন করতে গিয়ে সাসপেণ্ড হয়েছেন কিন্তু লড়াই ছাড়েননি। আমৃত্যু সবসময় খোঁজ রাখতেন সমিতির কাজকর্মের। আমাদের কাছে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্মরণসভায় রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেন মেধাবী ছাত্র ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। রাজনৈতিক চেতনার স্ফুলিঙ্গ ছিল ভেতরে। রহড়া অঞ্চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে সংগঠনের কাজ শুরু করেন। কঠোর ও কঠিন আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করেন চাকুরী জীবনের প্রথম থেকে। অসংখ্য নির্যাতন হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে, মাথানত করেননি। গোটা দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান পেনশন স্কীমের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কর্মচারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর এইসব শিক্ষার জন্যই তিনি স্মরণীয়

বিজয় শংকর সিংহ

হয়ে থাকবেন। একসময়ে যে পরিস্থিতিতে কর্মী আন্দোলনের রূপরেখাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি, আজ সেই পরিস্থিতি পুনরায় ফিরে এসেছে। গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ থেকে উগ্র

প্রবীর মুখার্জী

মৌলবাদ কায়েম হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটছে। তাই এই সময়ে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রামময় জীবন শিক্ষণীয় ও অণুসরণীয়। কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে একসূত্রে বাঁধাই শুধু নয়, শিখিয়েছিলেন ন্যায্য অধিকার আদায় করার প্রশ্নে কোনও আপস নয়, কর্মীদের স্বার্থে লড়াই আন্দোলনই হল একমাত্র পথ। তাঁর সেই কঠোর

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সংগ্রামের ধারা ও আদর্শ হোক আমাদের সকলের অনুসরণযোগ্য। □

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় মোদি সরকার এদেশে এক অশনি সংকেত

পুঁজিবাদের বহুল প্রচারিত মুখপত্র 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকার ৩১ আগস্ট, ২০১৯ সংখ্যার প্রচ্ছদ শিরোনাম হল, 'গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ শত্রু'। এই শিরোনামের নিবন্ধটিতে (পৃষ্ঠা ৯) বলা হয়েছে, ''এতদিন ধারণা চিল গণতন্ত্রের মৃত্যু হয় বন্দুকের নল, রাষ্ট্রদ্রোহ অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে জনস্বার্থের কথা বলে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করা হচ্ছে।'' উদাহরণ হিসেবে 'দ্য ইকনমিস্ট' হাঙ্গেরীর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছে। বলা হয়েছে, হাঙ্গেরীর শাসক দল 'ফিৎস্‌জে' সে দেশের সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে একে একে আইন প্রণয়নকারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, সংবাদ মাধ্যম প্রভৃতি সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনকি নির্বাচন বিধিও নিজেদের স্বার্থে পরিবর্তন করছে। ঐ নিবন্ধেই আরও বলা হয়েছে, হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানকে আইন ভাঙতে হয় না। কারণ তিনি তাঁর প্রয়োজন মত সংসদকে ব্যবহার করে আইন পরিবর্তন করে নিতে পারেন। তাঁর শত্রুদের দমন করার জন্য রাতের অন্ধকারে পুলিশ পাঠাতে হয় না। তাঁদের দমিয়ে রাখা যায় গোটা সংবাদ মাধ্যম ও কর আদায়কারীদের জুজু দেখিয়ে। দ্য ইকনমিস্টের মূল্যায়ণ হল, বহিরঙ্গের দিক থেকে হাঙ্গেরী একটি সতেজ গণতান্ত্রিক দেশ হলেও, মর্মবস্তুর দিক থেকে এটি এখন একদলীয় রাষ্ট্র।

শুধু হাঙ্গেরীই নয়, ঐ নিবন্ধেই বলা হয়েছে, অধিকাংশ পশ্চিমী গণতন্ত্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন সহ) গণতন্ত্রের হাল এখন একইরকম। আগে তা কখনও বাম আবার পরবর্তীতে দক্ষিণের দিকে, এইভাবে পেন্ডুলামের মতন দোল খেত। এখন পশ্চিমী গণতন্ত্র মানে নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। যদিও 'দ্য ইকনমিস্ট' প্রত্যাশামতই এই পর্যন্ত বলেই থেমেছে। পশ্চিমী গণতন্ত্রের বর্তমান বিশৃঙ্খল স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার মূল কারণ যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল কেন্দ্রগুলিতে নিদারুণ প্রলম্বিত সংকট সে কথা বলেনি। পুঁজিবাদের এই কাঠামোগত সংকট থেকে বেড়িয়ে আসার পথ না পেয়ে দেশে দেশে শাসকশ্রেণী মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে গায়ের জোরে অবদমিত করার জন্য বা ভুল পথে চালিত করার জন্য বেশী বেশী করে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাসম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি সমূহের ওপর যে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, সে কথাও দ্য ইকনমিস্টের বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত থেকেছে। ইউরোপীয় বৃহৎ পুঁজির কাছে দ্য ইকনমিস্টের টিকি বাঁধা রয়েছে বলে, তারা সার সত্যটাকে আড়াল করেছে। কিন্তু আমাদের অবস্থান যেহেতু দ্য ইকনমিস্টের বিপরীত মেরুতে, তাই মূল কারণ উহ্য রেখে যেকোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়। অর্থনীতির সংকট রাজনৈতিক স্তরে 'বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টি করছে। এটাই স্বাভাবিক। অতীতেও হয়েছে, প্রথম মহাসংকটের সময়। ফ্যাসিস্ট হিটলারতো ঐ সংকটেরই ফসল। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প, হাঙ্গেরীর ভিক্টর ওরবান, যুক্তরাজ্যের বোরিস জনসন বা ইতালির মাত্তিও সালভিনি হলেন ২০০৮ থেকে শুরু হওয়া একবিংশ শতাব্দীর মহা সংকটের ফসল। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিস্ট হিটলার বা স্পেনের ফ্যাঙ্কোর সাথে আজকের ডোনাল্ড ট্রাম্প বা ভিক্টর ওরবানের কর্মপদ্ধতির বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। হিটলার বা ফ্রাঙ্কো গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকেই ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, ট্রাম্প সাহেবরা কাঠামোটাকে বাইরে থেকে রঙ-চঙ মাখিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দিচ্ছেন। অবশ্য এই পার্থক্যও হিটলার ও ট্রাম্পের চারিত্রিক বা কর্মপদ্ধতির পার্থক্যের জন্য নয়। এই পার্থক্যের কারণও লুকিয়ে রয়েছে অর্থনীতির মধ্যেই। হিটলার ছিলেন জার্মান জাতীয় পুঁজির প্রতিনিধি। অন্যান্য জাতীয় পুঁজিকে হটিয়ে বিশ্ব বাজার দখল করাই ছিল তার লক্ষ্য। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে লগ্নীপুঁজির চরিত্র আন্তর্জাতিক। সারা বিশ্বে বিনা বাধায় ছুটে বেড়ানোই তার লক্ষ্য। সুতরাং গণতন্ত্রের বাহ্যিক কাঠামোটাকে টিকিয়ে রেখে ভেতর থেকে লগ্নী পুঁজির চলাচলের রাস্তা যদি তৈরী করে দেওয়া যায়, তাহলে কাঠামোটাকে আর ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন কি? হিটলার আর ট্রাম্পের বাহ্যিক পার্থক্য, তার কারণ এটাই। অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোর নির্মাণ-বিনির্মাণ ঘটে অর্থনীতির ভিত্তিতেই। একথাতো কবেই মার্কস সাহেব বলে গেছেন। যদিও 'দ্য ইকনমিস্ট' এই বিষয়টি অনুচ্চারিত রেখেছে।

দ্য ইকনমিস্টের নিবন্ধটির প্রেক্ষিত ইউরোপ হলেও, খুব সহজেই আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায়। শুধুমাত্র ওরবানের জায়গায় নরেন্দ্র মোদির নাম বসালেই বাকি সবটা মিলে যাবে। গণতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা বলতে যে যে প্রবণতাগুলির কথা দ্য ইকনমিস্ট উল্লেখ করেছে, তার প্রতিটিই, হয়তবা আরও বর্ধিত মাত্রায় আমাদের দেশের বহু গর্বের সংসদীয় গণতন্ত্রে বর্তমানে ক্রিয়াশীল। এবং এর সূচনা নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রতম জামানা থেকেই। দ্বিতীয় জামানায় তা আরও বে-আব্রু হয়েছে মাত্র। অবশ্য একথার মানে এটা নয় যে অতীতে এ দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো সর্বদা নিষ্কণ্টক থেকেছে। জরুরী অবস্থার সময়তো বটেই, এমনকি তার আগে ও পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে ভেঙ্গে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা হয়েছে। প্রাক্ মোদি জামানায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দূর্বল করার পদ্ধতি ছিল এরকমই। এর সাথে ছিল এক দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে, অন্য দলে চলে যাওয়া বা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত রাজ্য সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা বা বিমাতৃসুলভ আচরণ। এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অতীতে বিভিন্ন সময় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন—(১) প্রাক্ মোদি জামানার উল্লিখিত আক্রমণগুলি ছিল বাহ্যিক। খোলা চোখে দেখা যায় এমন। ফলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজটাও, অন্তত চেতনার স্তরে ছিল অনেকটাই সহজ এবং (২) ঐ সময়কার গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণগুলি ছিল মূলত শাসকশ্রেণির স্বার্থে এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসকদলের (জাতীয় কংগ্রেস) একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ঐ আক্রমণ ছিল চরিত্রগতভাবে সাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রথমবার নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে, তা কোন সাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত নয়। এগুলি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্জাত সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পরে, এই আদর্শগত লক্ষ্যই হল, ভারতীয় জনতা পার্টির পরিচালক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এজেন্ডা। অতীতে একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং একচেটিয়া জাতীয় পুঁজির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র গণতন্ত্রই। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর সেই সময় কোন আঁচড় লাগেনি। কিন্তু আজকে গণতন্ত্রের ওপর যে আক্রমণ (এবং যার চরিত্রটাও অনেকাংশে আলাদা) তা কিন্তু শুধুমাত্র গণতন্ত্রকে লক্ষ্যবস্তু বা 'টার্গেট' করে নয়। এখানে গণতন্ত্র 'মাধ্যম', যাকে ব্যবহার করে মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র। কারণটাও আমাদের সকলেরই জানা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আদর্শগত লক্ষ্য ছিল 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠন এবং যে রাষ্ট্রে সামাজিক নীতি নির্ধারিত হবে, কোন আধুনিক আইন সমন্বিত সংবিধানের ভিত্তিতে নয়। সামাজিক নীতি নির্ধারিত হবে ব্রাহ্মণ্যবাদের আকর গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'র ভিত্তিতে। আর এস এস-র প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ারের পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সরসঙ্ঘচালক গোলওয়ালকারের লেখা 'বাঞ্চ অফ থটস' বা 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড্' পড়লেই কি ধরনের সামাজিক কাঠামো তারা গড়ে তুলতে চায়, বা 'হিন্দুরাষ্ট্র' বলতে তারা কি বোঝাতে চায়, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সাথে তার পার্থক্য কোথায় ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর এস এস তার জন্মলগ্ন থেকেই (১৯২৫) এই লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা সমন্বিত যে স্রোত, আর ধাক্কায় তারা খুব বেশী এগোতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য 'ধাক্কা' শব্দটি ব্যবহার করা হল কারণ আর এস এস শুরু থেকেই ঐ স্রোতের বিরুদ্ধে ছিল। কারণ তাদের আদর্শের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন উপাদান নেই। না থাকাটাও খুব স্বাভাবিক। কারণ ফ্যাসিবাদী হিটলারের (ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই সবথেকে প্রতিক্রিয়াশীল রূপ) আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বকে বা ইহুদি ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করে, তাকেই দেশজ মোড়কে (ইহুদির পরিবর্তে মুসলমান) আর এস এস নিজেদের আদর্শ বানিয়েছে। তত্ত্বগত অনুকরণের পাশাপাশি সংগঠন গড়ে তোলা ও তাকে পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের গুরু হলেন মুসোলিনী ও হিটলার। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আর এস এস-র রক্তে ছিল না। দ্বিতীয়ত ধর্মীয় পরিচয়ই মানুষের নির্ণায়ক পরিচয়, আর এস এস-র এই বক্তব্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও কাজে লেগেছিল। কারণ তারাও সুকৌশলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য তার মধ্যে ধর্মীয় উপাদান গুঁজে দিতে আগ্রহী ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই পরিকল্পনা অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। কারণ স্বাধীনতা এলেও, তা এসেছিল ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে দুটুকরো করেই।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে আর এস এস-র ডালপালা ছড়ানোর আগেই গান্ধীজীর হত্যার সাথে তাদের নাম জড়িয়ে যায়। ফলে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে যায় আর এস এস। কিন্তু তার পরেও আশির দশক পর্যন্ত তারা খুব বেশী এগোতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণ, অর্থনীতির জনকাল্যাণকামী অভিমুখ। (বহু সীমাবদ্ধতা সহ) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাঠামো, সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ, জোট নিরপেক্ষ বিদেশনীতি প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে যে আবহাওয়া তৈরী করেছিল, তাতে আর এস এস-র পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়াই ছিল কঠিন। এই অস্তিত্বের সংকট থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য, তারা জরুরী অবস্থার সময় স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। জরুরী অবস্থার পর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, আর এস এস তার পূর্বতন রাজনৈতিক শাখা জনসঙ্ঘকে নতুন গড়ে ওঠা জনতা পার্টির সাথ প্রথমে মিশিয়ে দেয় এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টি নামকরণ করে তার রাজনৈতিক শাখাকে আলাদা করে নেয়। রাজীব গান্ধীর আমলে গৃহীত কিছু অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত (রামলালার পুজো করার জন্য বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়া বা শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সংসদে আইন করে খারিজ করা) আর এস এসকে নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাবরণ তৈরী করে দেয়। নয়ের দশকে শুরু হয় নতুন উদ্যোগে পথ চলা। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ছিল সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার ছাঁচ তৈরি করা। গোটা সমাজকে যে ছাঁচে ঢেলে তাদের আদর্শমতন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মোদি সরকারের দু'দুবার এক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে আর এস এস এখন চাইছে তাদের লক্ষ্যের দিকে একটা উল্লম্ফন দিতে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিজেদের পেটোয়া লোক বসানো, স্বয়ংশাসিত বিভিন্ন সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ, গো-মাতার মহিমা কীর্তন থেকে শুরু করে এন আর সি ও কাশ্মীর—সবই এই উল্লম্ফনের উপাদান। সাথে রয়েছে দ্য ইকনমিস্টের ভাষায় পোষ্য মিডিয়া। জরুরী অবস্থার নায়িকা ইন্দিরা গান্ধীও মিডিয়াকে এতটা পাননি। ফলে লড়াইটা আজ অনেকটাই কঠিন। লড়াইটা আরও কঠিন এই কারণে যে, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও দেশী-বিদেশী পুঁজির (মিডিয়াতো আসলে পুঁজিরই মুখপত্র) ক্ষমতাকে ব্যবহার করে যখন একটা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ সম্পর্কে সর্বজনীন মান্যতা তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে, তখন তাকে ঠেকানো শুধুমাত্র নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্ভবন নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট মতাদর্শভিত্তিক বিপরীত ভাষ্য। যা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে জনমতের পুনর্গঠনে সক্ষম হবে। আবার সংবিধানে বর্ণিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সুস্থিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নির্ভর জনকল্যাণকামী অর্থনীতির জমিতে। তাই নয়া উদারবাদী আর্থনীতির বিরুদ্ধে এবং 'জনকল্যাণকামী' অর্থনীতির পক্ষে জনমত গঠনের কাজটাও চালাতে হবে একই সাথে। কারণ একে অপরের পরিপূরক। □

১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

শোক সংবাদ

কমরেড রতন সাহা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রতন সাহা গত ১৯ আগস্ট, ২০১৯ সকাল ৮.১৫ মিনিটে হাওড়ার একটি বেসরকারী হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। প্রয়াত কমরেড রতন সাহার স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তমান।

১৯৮০-র দশকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরীতে যোগদান করেন তিনি। চাকুরীতে যুক্ত হয়েই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ডব্লু বি এন এম টি ই এ সমিতির সদস্য হন। কর্মচারীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দরদী মানসিকতা এবং বিভেদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই, তাকে কর্মচারীদের নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে আসে। তিনি পরবর্তীতে উক্ত সমিতির জেলা সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। আমৃত্যু তিনি উক্ত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি সমিতির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি একইসঙ্গে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও ছিলেন। সংগঠনের প্রতিটি স্তরেই তিনি তাঁর যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কমরেড সাহা তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে কখনও অন্যায়ের সাথে আপস করেননি।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হেল্‌থ ইন্সপেক্টর হিসাবে চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি ঐ সমিতির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। কমরেড সাহা সুগায়ক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্ মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লায়িজ এ্যাসোসিয়েশন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যৌথ উদ্যোগে কমরেড রতন সাহার স্মরণসভা ৯ সেপ্টেম্বর '১৯-এ আলিপুরের জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণা করেন পেনশনার্স সমিতির জেলা সম্পাদক গোপাল চ্যাটার্জী, ডব্লু বি এন এম টি ই এ-র জেলা সম্পাদক যুগময় চক্রবর্তী, উক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী এবং পরিবারের পক্ষ থেকে কমরেড রতন সাহার ভাই তপন সাহা। স্মরণসভা পরিচালনা করে দেবাশীষ ব্যানার্জী, পিনাকী বাগচী এবং শুভদীপ ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

রক্তদান শিবির

চেগুয়েভারার ৯১তম জন্মদিনে ও বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৯তম বর্ষ রক্তদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার ডিরোজিও ভবন প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ৩জন মহিলাসহ ৪৭ জন কর্মী রক্তদান করেন। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু সরকার এবং সভাপতি প্রদীপ রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অসীমা চ্যাটার্জী। □

বিজ্ঞপ্তি

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য সমিতি / জেলা কমিটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

রক্তদান

১। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে রক্ত দান করছেন কর্মচারী বন্ধু, সংগঠনের দার্জিলিং জেলা শাখা আয়োজিত রক্তদান শিবিরে (বাঁদিকে)। ২। রক্তদান কর্মসূচী উপলক্ষে সংগঠনে হাওড়া জেলা শাখার ডাকে কর্মচারী জমায়েত (নিচে)।

অমিত শাহর অর্থনীতি

প্রভাত পট্টনায়েক

কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান কেড়ে নেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অমিত শাহ রাজ্যসভায় কাশ্মীরের 'উন্নয়ন' প্রসঙ্গটি টেনে এনে বলেছেন, ভারতের অপরাপর অংশের সাথে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ এই অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করবে। তিনি বিশেষ করে কাশ্মীরের যুব সমাজের প্রতি আবেদন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। যখন ভারতের কর্মহীনতা গত ৪৫ বছরে সব থেকে খারাপ জায়গায় পৌঁছেছে, সেই সময়, ভারতের সাথে ঘনিষ্টতর সংযুক্তি কাশ্মীরের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করবে—এই যুক্তি বিস্ময়কর। কিন্তু, তবুও তাঁর দেওয়া যুক্তিগুলি একটু ভাল করে দেখা যেতে পারে। বিশেষ অবস্থা থাকুক বা না থাকুক—বৃহৎ শিল্প, যেগুলি স্থানীয় কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের সাথে যুক্ত নয়, হু হু করে কাশ্মীরে প্রবেশ করবে, এই ধারণা চূড়ান্তরকম হাস্যকর (যদিও শাহ বৃহৎ শিল্পের কথা বলেননি)। কাশ্মীরে কোন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবহন খরচটাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এবং সংবিধানের ৩৫এ ধারা, যে ধারায় কাশ্মীরে বাইরের লোকেদের জমি কেনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে, তা বাতিল হয়ে যাওয়ায় জমির দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে, এবং শাহ নিজেই প্রত্যাশিত ইতিবাচক উন্নয়নের চিহ্ন হিসেবে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। তাই যে কেউ কাশ্মীরে বৃহৎ শিল্প স্থাপন করবে, এই ধারণা অবাস্তব। এবং একই কথা প্রযোজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রেও।

সুতরাং উপত্যকায় যে ধরনের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে পারে, তা হল, যারা স্থানীয় কাঁচামাল, যেমন পশম, ফল, কাঠ বা মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই ঐ উপত্যকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। এদের প্রয়োজন সক্রিয় সহায়তা। এবং তার জন্য দরকার উপত্যকায় একটি সহানুভূতিশীল সরকার, বিশেষ অবস্থা বাতিল করে বা জমি কেনার বিধি-নিষেধ বাতিল করে যা সম্ভব নয়।

এইভাবে অবশ্যই ভাবা যেতে পারে যে, দেশের অপরাপর অংশের সাথে যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পেলে, বহুজাতিক সংস্থা বা বৃহৎ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উপত্যকায় এই ধরনের কার্যকলাপ গড়ে তুলবে যা প্রকারান্তরে উপত্যকার অর্থনীতিকে শক্তি যোগাবে। কিন্তু স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগ যে ধরনের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত, সেই একই কার্যকলাপে যদি দেশী বা বিদেশী বৃহৎ পুঁজি যুক্ত হয়, তাহলে তা কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রসারিত করে না। যদি কোন ফল হয়, তাহলে তা হল, স্থানীয় উদ্যোগকে অপসারিত করে কর্মসংকোচন ঘটাবে। যদি সময়ের সাথে সাথে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি বা প্রসারণের কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তাহলে স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা সরকারী সংস্থার সহায়তায় সেই কাজ করতে সক্ষম। সুতরাং স্থানীয় উৎপাদনে বৃহৎ পুঁজিকে ডেকে আনলে, সময়ের নিরিখে কর্মসংস্থান যে হারে বৃদ্ধি পাবে, তা কখনই স্থানীয় উৎপাদকের দ্বারা সৃষ্ট কর্মসংস্থানের হারের থেকে বেশী হবে না।

কিন্তু শাহের মত অনুযায়ী মূল আশার দিক হল বহিরাগতরা কাশ্মীরে জমি কেনার জন্য প্রবেশ করবে। অত্যাশ্চর্যের বিষয় হল হিমাচল প্রদেশ ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাজ্যে বহিরাগতদের জমি কেনার অধিকার নেই, অথচ শুধুমাত্র কাশ্মীরকেই উন্নয়নের নামে এই বিধিনিষেধ অপসারণ করতে বলা হল। কিন্তু জমির দাম বাড়লেই কি কাশ্মীরে উন্নয়ন হবে? যখন কোন ব্যক্তি জমি ক্রয় করেন, তখন তিনি তাঁর অপর কোন সম্পদের মালিকানা থেকে সরে এসে জমির মালিকানা লাভ করেন। আবার বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক বিপরীত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ক্রেতা কোন ধরনের মালিকানা ত্যাগ করে জমির মালিকানা পেলেন? যদি কোন উৎপাদনধক্ষম সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে কাশ্মীরে জমির মালিকানা পান, তাহলে তা ভারতের অপরাপর অংশে নেতিবাচক চিত্র তৈরী করবে। কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি এমন কোন বিষয় হবে না। এবং অমিত শাহের মনপসন্দ একটা আবহাওয়া তৈরী হবে, অর্থাৎ ক্রেতারা সব নগদ মূল্যে জমি কিনবেন। এমন ঘটনা ঘটলে তা প্রাথমিকভাবে দেশের অপরাপর অংশে বিনিয়োগ হ্রাস করবে না। আলোচনার স্বার্থে আমরা ধরে নিই কাশ্মীরে জমি কিনতে ইচ্ছুক ক্রেতারা ব্যাঙ্ক থেকে সহজেই ঋণ পাবে, এবং ব্যাঙ্ক ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা তৈরী করবে না।

এখন প্রশ্ন হল, বিক্রেতারা জমি বিক্রী করে যে টাকা পাবেন, সেই টাকা দিয়ে তাঁরা কি করবেন? উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় তাঁরা সাধারণভাবে ঐ টাকা উপত্যকায় বিনিয়োগ করবেন না, একমাত্র স্থানীয় উৎপাদনকে প্রসারিত করা ছাড়া। কিন্তু এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে বর্তমানে স্থানীয় পণ্যের উৎপাদন পুঁজির অভাবে ভুগছে। স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হয়ত বা আরও সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেই কাজ করতে হলে প্রয়োজন রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা; তাই জমি বিক্রী করে হাতে টাকা এলেই স্থানীয় উদ্যোগে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে না (কারণ তা হলে জমি বিক্রী না করেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেত)। এই নগদ অর্থ স্বাভাবিকভাবেই জমা পড়বে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে জমা পড়া এই অর্থ স্থানীয়ভাবে ঋণ দেওয়া হবে না। হয় এই অর্থ ঋণ হিসেবে কাশ্মীরের বাইরে চলে যাবে, বা ব্যাঙ্কেই অনুৎপাদক অবস্থায় পড়ে থাকবে। তাহলে যা দাঁড়াবে তা হল, একদিকে কাশ্মীরের জমি নগদের বিনিময়ে বহিরাগতদের হস্তগত হবে, অপরদিকে সেই নগদ অর্থও কাশ্মীর থেকে বহির্গমন করবে। উপত্যকার মানুষের হাতে কোনটাই থাকবে না। এর মধ্য দিয়ে উন্নয়ন বা কর্মসংস্থান কোনটিরই কোন সম্ভাবনা নেই।

অপরদিকে, যে জমিতে একসময় কোন না কোন উৎপাদন হত, সেই জমি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে একেবারেই অনুৎপাদক জমিতে পরিণত হবে। কারণ বহিরাগত ক্রেতারা অনেকবেশী আগ্রহী হবেন জমির দাম ওঠা নামা সংক্রান্ত ফাটকার ওপর অথবা উপত্যকায় গ্রীষ্মকালীন আবাস তৈরী করার জন্য। এর মধ্য দিয়ে উৎপাদনধর্মী কাজের সংকোচন ঘটবে এবং ফলস্বরূপ ঘটবে কর্মসংকোচন। তাই যেকোনভাবেই বিচার করা হোক না কেন, কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান বাতিল এবং বহিরাগতদের দ্বারা জমি ক্রয়ের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা তা প্রত্যাহার করলেও কর্মসংস্থানের ওপর তার কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না। বরং বিপরীতে উপত্যকার কর্মসংস্থানের সুযোগকে সঙ্কুচিত করবে। আর জমির মালিকানা দিল্লী ও মুম্বাইয়ের ধনীদের হস্তগত হবে।

যদি কেন্দ্রীয় সরকার এতটাই নিশ্চিত থাকত যে, কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থা বাতিল করলে ঐ রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, তাহলে বিশেষ অবস্থা বাতিল করার সাথে সাথে দু'জন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করার প্রয়োজন হত না। এবং যেহেতু বিশেষ অবস্থা বাতিলের পরবর্তীতে অবশ্যম্ভাবী হিংসার ঘটনা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে ঐ রাজ্যের অর্থনীতির যেটা মেরুদন্ড সেই পর্যটন শিল্প স্থায়ীভাবে সঙ্কুচিত হবে এবং কাশ্মীরী যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে আরও ধূসর করবে।

সুতরাং সংক্ষেপে বললে বলা যায়, 'উন্নয়ন'-এর শ্লোগান আসলে লোক ঠকানোর জন্য। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এই পথ বেছে নিল কেন? সহজ উত্তরটা হল, দেশের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের জন-বিন্যাসকে পরিবর্তন করার জন্য হিন্দুত্ববাদী শক্তির দীর্ঘদিনের দাবি এটাই। ঠিক যা ইসরায়েল প্যালেস্তাইনে করতে চাইছে।

এটা যেমন সত্যি, তেমনই অন্যান্য সম্ভাবনার দিকগুলিতেও আমাদের নজর দেওয়া দরকার। আসলে এই সরকার হল হিন্দুত্ববাদ-কর্পোরেট জোটের ফসল। তাই হিন্দুত্ববাদের প্রসারের পাশাপাশি কর্পোরেট স্বার্থে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ এই সরকারের লক্ষ্য। কাশ্মীর উপত্যকাকে কর্পোরেট মিত্রদের জন্য খুলে দেওয়া, তবে তা যতটা না উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তার থেকে অনেক বেশী আবাসন শিল্প এবং জমির ফাটকা কারবারের স্বার্থে জমি দখলের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। এই ধরনের আবাসন শিল্প যতটুকু কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি করবে তার থেকে অনেক বেশী কর্মসংকোচন ঘটাবে, ঐ জমিগুলিতে পূর্বের

▶▶ সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

এন আর সি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ ১৯,০৬,৬৫৭ জন

আসামে এন আর সির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৩১ আগস্ট, ২০১৯। বাদ পড়লেন ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জন মানুষ। অদ্ভুতভাবে বাদ পড়েছেন একই পরিবারের বাবা-ছেলে, রয়ে গেছেন মা। এমন কি বাদ পড়েছেন সেনাবাহিনীতে দেশের হয়ে চার প্রজন্ম লড়াই করা সেনা। নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি শাসিত আসাম সরকারের তাতে কোন মাথা ব্যাথা নেই। তারা পরে আছেন তাদের হিন্দুত্বের রাজনীতিতে। আসামের মন্ত্রী ভরসা দিচ্ছেন, যতক্ষণ নরেন্দ্র মোদি আছেন, অমিত শাহ আছেন ততক্ষণ হিন্দুদের দেশহীন হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু ধর্ম নির্বিশেষে কেউ এখন ওদের কথায় ভরসা রাখতে পাচ্ছে না। উদ্বেগ বাড়ছে হতাশা গ্রাস করছে তালিকায় বাদ পড়া লোকেদের। ইতিমধ্যে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছেন এদেরই একজন। কেমন হয়েছে এই তালিকা? উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তেজপুরের অবিনাশ চন্দ্র দেবের কথা। তিনি ১৯৭০ সালের মে মাসে বায়ুসেনায় যোগ দেন। সংগ্রাম পদক-সহ তিনটি পদক পেয়েছেন তিনি। তাঁর বায়ুসেনার নথিই যথেষ্ট মেনে নিয়ে ছেলে অজয় দেব লেগাসি জমা দেন। কিন্তু প্রথম তালিকায় নাম আসেনি মরাভারলির বাসিন্দা দেব পরিবারের। এরকম উদাহরণ আরও আছে।

দীর্ঘদিন আসামের সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন দিলীপ চন্দ। তাঁর ছেলে সেনাবাহিনীর থেকে অবসর নিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গে চাকরী করেন। ১৯৫৪ সালের পারিবারিক সরকারী নথি জমা দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু চূড়ান্ত এন আর সি তালিকায় নাম নেই বাবা-ছেলের। দিলীপবাবুর স্ত্রী সীমা চন্দ দাসের নাম তালিকায় উঠেছে তাঁর বাপের বাড়ির নথির দৌলতে। এই অবস্থায় কি করবেন ভেবে রাতের ঘুম উড়ে গেছে দিলীপবাবু এবং তাঁর মত হাজার হাজার পরিবারের। আসামের পূর্ত, স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন নরেন্দ্র

মোদি, অমিত শাহ থাকতে ভয়ের কিছু নেই। সব ভারতীয়দের নাম না তোলা এবং সব বিদেশির নাম বাদ যাওয়া পর্যন্ত তালিকা নাকি চূড়ান্ত নয়। ওঁদের ভাষায় অবশ্য হিন্দু মানেই ভারতীয় এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলিম মানেই বিদেশী।

৩১ আগস্ট, ২০১৯ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হাবার আগে দুবার খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়। ৩০ জুলাই ২০১৮ তে, দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের সময়ই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবার দিন ঘোষিত হয়েছিল ৩১ আগস্ট, ২০১৯। আসামে এন আর সি তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য মোট আবেদন করেছিলেন ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬১ জন। প্রথম খসড়া তালিকায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের নাম ওঠে। দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত খসড়া তালিকায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৭৭ জন। দ্বিতীয় খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিলেন ৪০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৪ জন। ফের আবেদন করেন ৩৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৩০ জন। আবেদন করেননি ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৫৭ জন। এছাড়াও কিছু আবেদনের পাল্টা অভিযোগও জমা পড়ে। ৩১ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় নাম আছে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৪ জনের। বাদ পড়েছে ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জন, যা মোট আবেদনের ৫.৭৭ শতাংশ। তালিকায় বাদ পড়ার কারণ হিসাবে আলোচনায় চারটি বিষয় উঠে আসছে। প্রথমত, যাঁরা আবেদনই করেননি। দ্বিতীয়ত, যাঁরা 'ডি' ভোটার বা সন্দেহজনক ভোটদাতা হিসাবে চিহ্নিত। তৃতীয়ত যাঁরা, 'ডি এফ' অর্থাৎ ঘোষিত বিদেশী। চতুর্থত, সেইসব পরিবার যাদের নাগরিকত্ব নিয়ে মামলা চলছে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে।

চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণার সঙ্গে অবশ্য এন আর সি-র পক্ষ থেকে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তালিকায় নাম না থাকা মানেই 'বিদেশী' ঘোষিত হওয়া নয়। তবে বাদ যাওয়া মানুষগুলির স্ট্যাটাস কি, তাঁদের কোন কোন অধিকার থাকছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সরকার এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে জানাক তারই দাবি উঠেছে। তালিকায় নাম না থাকা মানুষ যাতে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আইনী সহায়তা পেতে পারেন সে ব্যাপারেও সরকারকে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

যাঁদের নাম বাদ গেছে, তাঁদের মধ্যে হিন্দিভাষী, পাঞ্জাবী, নেপালী, কোচ, রাজবংশী, রাজস্থানের মানুষ রয়েছেন। তবে সর্বাধিক আছেন ভাষিক সংখ্যালঘু বঙ্গভাষীরা। এই ভাষিক সংখ্যালঘু বঙ্গভাষীদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান, দুই ধর্মের মানুষই রয়েছেন।

এন আর সি-র চূড়ান্ত তালিকায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন সংগঠন। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু), বিজেপির জোট সঙ্গী অসম গণ পরিষদ তাদের হতাশা ব্যক্ত করেছে। তাদের বক্তব্য আরও বেশী মানুষের নাম বাদ যাওয়া উচিত ছিল, তাদের চাহিদা একশো শতাংশ বাংলাদেশী মুক্ত নাগরিকপঞ্জী।

আসামে এন আর সি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের মনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। নিদ্রাহীন রাত কাটাতে হচ্ছে তাঁদের সপরিবারে। এই অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

প্রথমত, যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের অবস্থান ও অধিকার প্রসঙ্গে সরকারের স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা উচিত। এই বাদ পড়া মানুষদের আবেদনের শুনানি এবং পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বর্তমান অধিকার ও সুবিধাগুলি বজায় থাকবে কি না এই প্রসঙ্গেও সরকারের ইতিবাচক ঘোষণা অতিদ্রুত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ঘোষিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাদ পড়া মানুষেরা নিয়ম অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে বিদেশি ট্রাইবুনালে আবেদন জানাতে পারবেন। এই বিদেশি ট্রাইবুনাল কোনও বিচার বিভাগীয় সংস্থা নয়, প্রশাসনিক সংস্থার মতনই এটি কাজ করে। তাছাড়া এই সংস্থার কর্মপদ্ধতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। এটাও সরকারের দেখা প্রয়োজন। একটি বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা পনার মাধ্যমেই এই আবেদনের অধিকার বিবেচিত হোক এটাই তালিকায় বাদ যাওয়া মানুষগুলির দাবি।

তৃতীয়ত, ট্রাইবুনাল যাদের বিদেশী বলে ঘোষণা করবে তাদের বন্দি শিবিরে পাঠানোর চলতি পদ্ধতি নিয়েও মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। সর্বোপরি এই পদ্ধতি মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

এইসব নানা বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করুক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এইটাই এই সময়কার মৌলিক দাবি। □

মানস কুমার বড়ুয়া

প্রসঙ্গ কাশ্মীর

সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল আসলে লোক ক্ষেপানোর এক জঘন্য কৌশল

উৎসর্গ মিত্র

অবশেষে ঘটনাটা ঘটিয়েই ছাড়ল মোদি বাহিনী। সংসদে সংখ্যাধিক্যের জোরে ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন করে বাতিল করে দিলো ৩৭০ এবং ৩৫(ক) ধারা, কেড়ে নিলো কাশ্মীরকে দেওয়া বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত রাজ্যের তকমা। সাধারণত যেকরম নাটক দেখতে আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অভ্যস্ত, সেরকম নাটক করেই তিনি জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতবাসীকে সমানভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হলো এবং স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসা এক 'ঐতিহাসিক ভুলের' পরিসমাপ্তি ঘটলো এই সংবিধান সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে। ওনার অন্যান্য নাটকের মতো এটিও অসার, কারণ শুধু কাশ্মীর নয়, এরকম আলাদা করে বিশেষ সুবিধা ভোগ করা রাজ্যের সংখ্যা দেশের মধ্যে নয় নয় করেও দশটি। তবু সেগুলির কোনটিকে নিয়ে কোনও বক্তব্য তাঁর বা তাঁর দলের নেই। শুধুমাত্র কাশ্মীর নিয়েই বক্তব্য তাঁর, তাঁর দলের এবং তাঁর দলের নিয়ন্ত্রক আর এস এস-এর দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে এবং এমন ভাবেই রয়েছে, যেন কাশ্মীরের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধাগুলি কেড়ে নিলেই দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কোনো সন্দেহ নেই, 'বিশেষ উদ্দেশ্য' নিয়েই কাশ্মীরের কফিনে পেরেক মারা হলো, তাকে দেশের বাইরে করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবধারার প্রতি এ এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা।

কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে তার ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। দ্বাদশ শতাব্দীতে কলহন রচিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিনী' বলছে এক সময়ে এই কাশ্মীর আসলে একটি সুবিশাল হ্রদ ছিল। বিষ্ণু বরাহ অবতারে নাকি এই হ্রদের জল খাল কেটে বারামুলার (পৌরাণিক 'বরাহ-মুলা' বা বরাহের দাঁত) মধ্যে দিয়ে বাইরে বার করে দেন। পরবর্তীকালে কাশ্যপ মুনি সমতলের ব্রাহ্মণদের সেখানে বসবাস করার জন্যে ডেকে নিয়ে আসেন। সেই থেকে এই জায়গায় নাম হয় 'কাশ্যপ-মেরু', যা নাকি পরিবর্তীতে লোকমুখে 'কাশ্মীর'-এ পরিণত হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, সেই সময়ে এখানকার প্রধান শহরের নাম ছিল 'কাশ্যপপুর'। ক্লডিয়াস টলেমির গ্রন্থেও এই শহরের উল্লেখ আছে 'কাসপেরিয়া' বলে। কালক্রমে এই 'কাসপেরিয়া'ই কাশ্মীর-এ পর্যবসিত হয়। যেহেতু কাশ্মীর সম্পর্কে রাজতরঙ্গিনী-ই প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ, সেহেতু একেই প্রামাণ্য হিসেবে ধরে নিতে হবে। ইতিহাসবিদেরা পরবর্তীকালে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে এখানে শুধু হিন্দুরা নন, এক সময়ে জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী রাজারাও রাজত্ব করেছেন, তবে কখনওই সেখানে ধর্মে ধর্মে বিভেদের কোনও দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। যাইহোক, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাশ্মীর ছিল আফগান দুরানি সাম্রাজ্যের (আহমেদ শাহ দুরানি যার প্রতিষ্ঠাতা) অংশ। ১৮১৯ সালে দুরানিদের হাত থেকে কাশ্মীর দখল করেন 'পাঞ্জাব কেশরী' রণজিত সিংহ। সেই সময়ে শিখেদের হয়ে জম্মুর শাসনকর্তা ছিলেন গুলাব সিং। রণজিতের কাশ্মীর দখলের পর গুলাব সিং পর পর সেনা অভিযান করে ১৮৪০ সালের মধ্যে কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী সমস্ত রাজ্যেই জয় করে ফেলেন। ১৮৪৫ সালে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখদের পরাজয় ঘটলে 'লাহোর চুক্তি'র মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয় এবং পরবর্তীকালে একে করদ রাজ্যে পরিণত করে 'অমৃতসর চুক্তি'র মধ্যে দিয়ে কোম্পানি এর শাসনভার গুলাব সিংয়ের হাতেই তুলে দেয় মোটা টাকার বিনিময়ে। গুলাব নিজেকে 'জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজ' ঘোষণা করে শাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। সেই থেকে ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সময় পর্যন্ত কাশ্মীর ইংরেজদের অধীনে এক স্বাধীন করদ রাজ্য (প্রিন্সলি স্টেট) হিসেবেই পরিগণিত হয়ে এসেছে, সরাসরি বৃটিশ শাসন সেখানে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কাশ্মীরীদের ৭৭ শতাংশ ছিলেন মুসলিম, ২০ শতাংশ হিন্দু আর অন্যান্যরা মিলে বাকি ৩ শতাংশ, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাশ্মীরে হিন্দু রাজার শাসনই বলবত ছিল এবং বলা বাহুল্য, সে শাসনে মুসলমানেরা যথেষ্টই অবদমিত ছিলেন। হিন্দুদের তুলনায় তাঁদের করের পরিমাণও ছিল অনেক গুণ বেশি।

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট ১৯৪৭' পাশ হয়। এরই সূত্র ধরে ১৫ আগস্ট বৃটিশ রাজের উত্তরাধিকারী হিসাবে জন্ম নিলো 'ভারতীয় যুক্তরাজ্য' ও 'স্বাধীন পাকিস্তান' নামে দুটি দেশ। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডন্স এ্যাক্টে বলা হয়েছিলো যে, ''এর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ রাজের সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদির অবসান ঘটলো।'' ফলে স্বাধীন করদ রাজ্যগুলির নিজেদের ক্ষমতা এসে গেল ভারত কিম্বা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার অথবা স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো রাজ্য তখন কাশ্মীর এবং তার রাজা তখন হরি সিং। রাজ্যের সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে ক্ষুণ্ণ হবে এবং হিন্দুরা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চাইবে না বিবেচনা করে প্রথমে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্বাধীন ভাবে থাকার, কিন্তু পরে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। পাকিস্তান জুলাই মাস থেকেই চেষ্টা করে আসছিল যাতে হরি সিং তাদের সাথেই যোগ দেন। হরিকে নানাভাবে প্রলোভনও লাগাতর দেখিয়ে চলছিল তারা। কিন্তু যখন বোঝা গেল যে ক্রমশঃ তিনি ভারতের দিকেই ঝুঁকছেন, তখন তারা অন্য পথ ধরলো। স্থানীয় মানুষদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে পুঞ্চ সেক্টরে গোপনে উস্কানি দেওয়া শুরু হলো, যাতে সেখানকার মুসলমানেরা হরির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তোলার জন্যে পশ্চিম পাঞ্জাবের দিক থেকে কাশ্মীরে রসদ আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো। পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতারা, এমনকি সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আব্দুল কায়ুম খান পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর কর্নেল আকবর খান এবং সরদার হায়াত খানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি এর একটি প্রস্তাব ছিল কাশ্মীরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশের এবং অপরটি পাখতুন উপজাতি বিদ্রোহের। ফলে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ এবং বিদ্রোহের প্রস্তুতি।

এদিকে স্বাধীনতার রেশ ধরে রাওয়ালপিন্ডি ও শিয়ালকোট থেকে ব্যাপক সংখ্যায় শিখ এবং হিন্দু জম্মুতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। এদের মুখে পাকিস্তানে অত্যাচারের কথা শুনে ওই সেপ্টেম্বর মাসেই জম্মুতে শুরু হয়ে যায় মুসলিম নিধন পর্ব। অক্টোবরে সে সন্ত্রাস আরও ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস বলছে, সেই সময়ে হিন্দু ডোগরা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ছিল এই হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকায়। এক ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম এই ঘটনাক্রমে প্রাণ হারান, এক বড়ো আংশ পালিয়ে যান পশ্চিম পাকিস্তানে, আবার কেউ কেউ আশ্রয় নেন পশ্চিমদিকে পুঞ্চ এবং মীরপুরে। এই সমস্ত

জায়গাতেই তখন বিদ্রোহের মহড়া চলছে। জম্মুর ঘটনা সে মহড়ায় ঘৃতাহুতি দেয়। মুসলিম কনফারেন্সের নেতা সারদা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ২২ অক্টোবর কাশ্মীরের পশ্চিম অংশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নেয় এবং ২৪ অক্টোবর সেখানকার পালান্দ্রিতে গঠিত হয় 'আজাদ কাশ্মীর' সরকার। বলা বাহুল্য, জম্মুতে মুসলিম নিধনে আর এস এস এতো উৎসাহ না দেখালে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না কারণ মুসলিম লীগের নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও জম্মুর মুসলিমেরা কিন্তু মোটামুটি শান্তই ছিলেন এবং পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কোনো উদ্যোগই তাঁদের ছিল না নিধন পর্ব শুরু না হওয়া পর্যন্ত।

মুখে যাই-ই বলুন, বহিঃশত্রু ঠেকানোর ক্ষমতা হরি সিংয়ের ছিল না। তিনি নেহরু আর প্যাটেলের কাছে লোক পাঠালেন সাহায্যের আবেদন নিয়ে। এটাও তিনি বললেন যে, এর বিনিময়ে ভারতের সাথে যুক্ত হতেও রাজি তিনি। নেহরু প্রথমেই শর্ত দিলেন যে এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করার আগে জেলে বন্দী শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দিতে হবে। এখানে শেখ আবদুল্লার কথা একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন কারণ ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার পর থেকেই বিজেপি-র আই টি সেলের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধারাবাহিকভাবে শেখ আবদুল্লার নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে ইতিহাসের মোড়ক দিয়ে এবং বলা বাহুল্য, তাদের অন্যান্য ইতিহাস চর্চার মতো এগুলিও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ভাষণ। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করা আবদুল্লার শৈশব কেটেছিল অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে। তবু অত্যন্ত মেধাবী আবদুল্লা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর নজরে আসে কাশ্মীরে বিশেষতঃ রেশম শ্রমিকদের দুর্দশা আর তার বিরুদ্ধে তাদের প্রাণপণ লড়াইয়ের ঘটনাবলী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রগতিশীল ভাবধারার সাথে পরিচিত হওয়ার সুবাদে আবদুল্লা বুঝতে পারেন যে কাশ্মীর থেকে রাজন্য প্রথার উচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত কাশ্মীরবাসীর দুর্দশার অবসান ঘটবে না। প্রকৃত গণতন্ত্র চাই, নির্বাচিত সরকারের শাসন চাই। সুতরাং আরও কয়েক জনের সাথে কাশ্মীরে তিনি গড়ে তুললেন সেখানকার প্রথম রাজনৈতিক দল 'অল কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স' ১৯৩২ সালে। তিনিই হলেন এর সভাপতি। দলের হয়ে প্রথম ভাষণ দিতে গিয়েই তিনি বললেন, নামের মধ্যে 'মুসলিম' কথাটা থাকলেও এ মোটেই মৌলবাদী কোনো দল নয়। এর কাজ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র কাশ্মীরবাসীর অধিকার আদায়ের জন্যে লড়াই করা। অচিরেই মানুষ এই দলের ওপর আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। স্বাভাবিক ভাবেই আবদুল্লার কার্যকলাপ হরি সিংয়ের পছন্দ হলো না এবং সবান্ধবে তাঁর ঠাঁই হলো হরির জেলে। কাশ্মীরের ইতিহাসে যে তিনজন শিক্ষিত মানুষ প্রথম জেলে গিয়েছিলেন, আবদুল্লা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি তাঁকে। জেল থেকে বেরিয়েই আবার নেমে পড়েছিলেন লক্ষ্য পূরণের লড়াইয়ে। কনফারেন্সের লড়াইয়ের সাথে খোলা মনে যুক্ত হতে কাশ্মীরের অমুসলিম দলগুলির দ্বিধা দেখে তিনি এবার বুঝতে পারলেন যে দলের নামের সাথে 'মুসলিম' কথাটা যুক্ত থেকে যাওয়ার কারণে যতই নিরপেক্ষ ভাবে চলার চেষ্টা হোক না কেন, সেখানকার অমুসলিম দলগুলির দ্বিধা থেকেই যাচ্ছে। মনে-প্রাণে ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ আবদুল্লা এবারে নিজের দলের মধ্যে দীর্ঘ প্রচার করে, নেতাদের ঐকমতে এনে তার নাম পালটে করে দিলেন 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' (১৯৩৯)। এমনি এমনি কাশ্মীরের মানুষ তাঁকে 'শের-ই-কাশ্মীরী' বা কাশ্মীরের বাঘ বলে মানতো না!

ওদিকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে সে সময়ে আবদুল্লার মতো একইরকম গণতন্ত্র আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই চালাচ্ছেন জওহর লাল নেহরু। দুজনেই বারে বারে জেলে যাচ্ছেন মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করার অপরাধে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই দুজনের যোগাযোগ ঘটতে এবং সেই যোগাযোগ বন্ধুত্বে পরিণত হতে বেশি সময় নেয়নি আর এ কারণেই হরি সিং যখন স্বাধীন ভারতের সাহায্যের জন্যে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলেন নেহরুর সামনে, তখন তিনি প্রথমেই বলেছিলেন রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরাধে সেই সময়ে জেলে ফের অবরুদ্ধ আবদুল্লার মুক্তির কথা। আবদুল্লা মুক্তি পেলেন। কিন্তু কাশ্মীরের হয়ে পাকিস্তানের সাথে লড়াইয়ে নামতে গেলে কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ হতে হয়, নতুবা ভারতের কাছ থেকে সামান্য কিছু সামরিক সাহায্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। হরি সিং প্রথমটাই বেছে নিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম গর্ভনর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭-এ তিনি সই করলেন অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে। সদ্য স্বাধীন দেশ ভারতবর্ষ তখন টগবগ করে ফুটছে। সে বললো মহারাজার কথায় হবে না, সেখানকার মানুষেরও এ ব্যাপারে মতামত চাই। রাজার ইচ্ছায় মানুষ নড়বে না, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের ইচ্ছায় রাজাকে চলতে হবে। সেই মতামত না আসা পর্যন্ত এই অন্তর্ভুক্তি অস্থায়ী থাকবে। সেখানকার সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলো। একই সময়ে, একইরকম ভাবে উত্তর কাশ্মীরের গিলগিট এজেন্সি, চিলাস, কো গাজির, ইশকোমন, ইয়াসিন, পুনিয়াল, হাঞ্জা, নাগার প্রভৃতি অঞ্চলগুলির মানুষের দাবি মেনে এই জায়গাগুলোর স্থানীয় শাসকেরা পাকিস্তানের সাথে নিজেদের যুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ এরা 'স্বেচ্ছা'য় পাকিস্তানের সাথে যোগ দিয়েছিল, তাদের ওপর কাশ্মীরের মতোই কোনও জোর খাটানো হয়নি।

যাইহোক, 'অস্থায়ী' ভাবে হলেও কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হলো, স্বাভাবিক ভাবেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তখন ভারতের। বিমানে করে ভারতীয় সেনা যখন শ্রীনগরে পৌঁছল, তখন সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দেখা গেল, শুধু বিমান বন্দরই নয়, গোটা শ্রীনগর শহরেই যাতে কোথাও যেতে ভারতীয় সেনার অসুবিধে না হয়, তার জন্যে হিন্দু হোক অথবা মুসলিম, শিখ হোক অথবা অন্য কোনও ধর্মের—কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব জায়গায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবকেরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে! শুধু টহল দেওয়াই নয় স্বেচ্ছাসেবকেরা এমনকি ভারতীয় সেনাদের সাথেও সমান তালে সেদিন লেগে পড়েছিল বহিঃশত্রুর হাত থেকে নগর সুরক্ষায়। এদের সবার নেতৃত্বে শেখ আবদুল্লা। যারা এই লোকটিকে এখন 'ধর্মান্ধ', 'হিন্দু বিদ্বেষী' ইত্যাদি প্রমাণ করতে চাইছে, তারা আসলে মানুষকে মূর্খ ভাবে। এরা ভুলে যায় যে চেষ্টা করেও ইতিহাস মোছা যায় না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কাশ্মীরের মানুষ শেখ আবদুল্লাকে চিরকাল মনে রাখবে তাঁর ধর্ম নিরপেক্ষ উজ্জ্বল ভূমিকার জন্য।

পাকিস্তান ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিল না। কাশ্মীরের পশ্চিম অংশে, বিশেষত বারামুলা অঞ্চলে অস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে এবারে সরাসরি বিদ্রোহীদের তারা মদত দেওয়া শুরু করে। বিদ্রোহী দমনে ভারতীয় সেনাদের সাথে ন্যাশনাল কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকাও সে সময়ে উল্লেখ করার দাবি রাখে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাউন্টব্যাটেন ছুটে যান জিন্নাহের কাছে। প্রস্তাব দেন কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যে সেখানে গণভোটের। জিন্না সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি যুক্তি দেন কোনও রাজ্যের সংখ্যাগুরু অধিবাসীর ধর্মের ভিত্তিতেই ঠিক করা উচিত সেই রাজ্য কোন দেশের সাথে যুক্ত হবে। আসলে তাঁর ভয় ছিল গণভোট হলে ভারতীয় সেনার সামনে এবং শেখ আবদুল্লার মতো একজন মানুষের উপস্থিতিতে সাধারণভাবে কোনো কাশ্মীরবাসী কখনই পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে মত দেবেন না এবং এ কারণেই কাশ্মীর দখলে সরাসরি আইনি পথে না গিয়ে বে-আইনি অনুপ্রবেশের ওপরেই তিনি বেশি জোর দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনোভাব আঁচ করতে পেরে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দেন কাশ্মীর থেকে উভয় পক্ষের সেনা অপসারণের এবং রাষ্ট্র সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের। কিন্তু এই প্রস্তাবও নাকচ হয়। মাউন্টব্যাটেন ফিরে আসেন। একই ভাবে ব্যর্থ হয় নেহরুর সাথে পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের বৈঠকও। এ কথা বলাই যায় যে, ভারতের এক অঙ্গ রাজ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর বাদে গণভোটের ব্যবস্থা ভারত সরকার একাই হয়তো বা করতে পারতো, সেখানে অন্য কারুর মতামতের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানের সাথে ভারতের কথাবার্তা চালানোটা ছিল গণভোটকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা।

পরবর্তী পর্বে শেখ আবদুল্লার আপত্তি ত্ত্বেও রাষ্ট্র সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা তুলে ধরা হয়েছিল ভারতের পক্ষ থেকে।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

সাহসী, সমৃদ্ধ চেতনাসম্পন্ন ও আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়েই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে

বিজয় শংকর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক,
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

সংকটময় তাৎপর্যপূর্ণ এক আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সংগঠনের ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সারা বিশ্ব আজ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত যা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে কোন রাস্তা খুঁজে বের করতে পারছে না। বিশ্বের দেশে দেশে নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যায় ক্রমশ হ্রাস, মজুরী কমানো, সাধারণ মানুষের উপর পরোক্ষ কর বৃদ্ধি আর বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিপুল কর ছাড়সহ একাধিক ভয়ংকর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান যা শ্রমিক কর্মচারী শ্রমজীবী মানুষের কাছে মারাত্মক বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের উপর চরম শোষণের বিরুদ্ধে যখন স্বাভাবিকভাবে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগঠিত করছে তখন মানুষের ঐক্যকে ভাঙার লক্ষ্যে অভিবাসী, জাত-পাত, ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজনের ন্যক্কারজনক রাজনীতি চলেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে যখন পুঁজি তার মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষেও সাধারণ মানুষের উপর শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশে দেশে লড়াই হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্রতর এবং একাধিক ধর্মঘট হচ্ছে।

আমাদের দেশে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফলাফলে কেন্দ্রে পুনরায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার সরকার প্রতিষ্ঠা করেই আর এস এস-বি জে পি আরও উৎসাহিত হয়ে গতি সঞ্চার করে তাদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করতে জনবিরোধী কাজগুলি করতে শুরু করেছে। আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি, ৪৫ বছরে সর্বাধিক বেকারী, ধনী ও দরিদ্রের আয়ের ব্যবধান ও তার ক্রমশঃ বৃদ্ধি, নোট বাতিল ও জি এস টি-র ধাক্কায় মানুষের অসহনীয় অবস্থা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিকে পুলওয়ামা ও বালকোটের ঘটনার প্রেক্ষিতে তীব্র উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধোন্মাদনার প্রচারের আড়ালে চলে গেছে। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবন যন্ত্রণা চাপা পড়ে গেছে। কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা ব্যায় করেছে আর এস এস-বি জে পি-কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। এক কথায় আদানি আম্বানির জয় হয়েছে।

৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেবে, আরো দশটি পরে যুক্ত করেছে। কর্মসংস্থানহীন বাজেট করেছে। সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়েছে। পরোক্ষ কর বৃদ্ধি ও দেদার প্রত্যক্ষ করে ছাড়। ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরৎ দিচ্ছে না বড় বড় শিল্পপতি মাফিয়ারা তার কোন উদ্যোগ নেই। ভয়ংকর দিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত তহবিল থেকে অর্থ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পাবে। বামপন্থীরা ইতিমধ্যে প্রচারে নেমেছে। তারাই একমাত্র মানুষের স্বার্থে কথা বলছে।

যখন চরম শোষণ নামিয়ে আনা হয়েছে তখন মানুষ রাস্তায় নামবে এটাই স্বাভাবিক যা ইতিমধ্যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। তখন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ভাগ করে রাজ্যকে ভেঙে দেওয়া হল। দেশের সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হল শুধু তাই নয় কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার—কেড়ে নেওয়া হল। কোন আলোচনা ছাড়াই রাতের অন্ধকারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন কাশ্মীর কারগারে পরিণত হয়েছে। মানুষের স্বধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একমাত্র বামপন্থীরাই দেশের ঐক্য ও সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর ভয়ংকর আক্রমণের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। সাধারণ মানুষ বলছেন, হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এক ফ্যাসিবাদী প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদজ্জনক। বামপন্থীরা একমাত্র মানুষের জীবন যন্ত্রণা নিয়ে ও দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে বিকল্প ভাষ্য তুলে ধরা সহ দেশের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে লড়াই-সংগ্রাম জারি রেখেছে।

আমাদের রাজ্যে ২০১১ সালে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের পর রাজ্যের সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীরাও আর্থিক ও অধিকারগত পাহাড়প্রমাণ বঞ্চনার শিকার। যা এককথায় দেশের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এরকম যন্ত্রণাক্লিষ্ট বঞ্চনা ও রাজ্যের সাধারণ মানুষের সাথে সাথে প্রশাসনের অভ্যন্তরেও লুম্পেনবাহিনীর কুৎসিত আক্রমণ এবং একাংশের লেজুড়বৃত্তিকারী আমলাদের অগণতান্ত্রিক ভূমিকাকে মোকাবিলা করেই ধারাবাহিকভাবে সাহসিকতার সাথে প্রত্যক্ষ লড়াই-সংগ্রাম জারি রয়েছে।

কর্মচারী সমাজ ও তাদের পরিবারকে রক্ষা করার তাগিদ থেকে এবং সর্বোপরি রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ যেহেতু নিদারুণভাবে আক্রান্ত—এইরকম একটা গণতন্ত্র বিপন্ন পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রশাসনের অভ্যন্তরে সংগঠনের নীতি ও আদর্শে অটুট থেকে, মাথা নত না করে, কর্মচারীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিনিয়ত চোখে চোখ রেখেই সাহসের সাথে লড়াই সংগ্রাম পরিচালনা করছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের লড়াইয়ের সর্বোচ্চ হাতিয়ার ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে সরকার। ডায়াস-নন বেতন কাটা, দূর-দূরান্তে বদলি, শো-কজ, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, এলাকা থেকে উৎখাত, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, জেলে পোরা, নির্মমভাবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা, অফিস-ক্যাম্পাসে পুলিশি নির্যাতনের বলি, ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার গুঁড়িয়ে ও পুড়িয়ে দেওয়া, একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তর দখল প্রভৃতি ফ্যাসিস্টধর্মী নৃশংস আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে সংগঠনকে।

রাজ্যে এরকম স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের মোকাবিলা করেই ২০১১ সালের পর থেকে সংগঠন ধারাবাহিক কর্মসূচী পালন করছে। কাকদ্বীপ চলো, নবান্ন অভিযান, পে-কমিশন দপ্তর অভিযান, টিফিনের সময় একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচী, এছাড়া টিফিনের সময় অতিক্রম করে সরকারকে হুঁশিয়ার জানিয়ে ২ ঘণ্টার বিক্ষোভও হয়েছে। সব কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নবান্ন অভিযান এবং নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার ও পরবর্তীতে দূর-দুরান্তে বদলি করা যা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে আর্থিক ও অধিকারগত দাবিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে একাধিক কর্মসূচী টিফিনে ও ছুটির পর পালিত হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। ঐ সমস্ত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার সহ তাঁদের দপ্তর থেকে রাজ্য সরকারকে বিষয়গুলি জানানো হয়েছে। সর্বভারতীয় সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার আর্থিক দাবি ও নেতৃত্বের গ্রেপ্তার সহ বদলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন এবং কলকাতায় এসে প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। ধারাবাহিক লড়াই-সংগ্রামের চাপে এই প্রথম সরকার আমাদের ডাকতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সাথে সংগঠনের আলোচনা হয়। ঐ আলোচনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে আর্থিক ও অধিকারগত দাবিগুলি সম্পর্কে সংগঠনের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা হয়। আগামীদিনে লড়াই সংগ্রাম আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে শুধু তাই নয়, সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিতে হবে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে সংগঠনের ঊনবিংশতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনে সংগঠনের আহ্বান ছিল, "পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া ও মোকাবিলা করার শপথ নেওয়ার"— দেশের ও রাজ্যের যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে সংগঠনকে। গভীর ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করেই ধারাবাহিক লড়াই সংগ্রামে থাকতে হবে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও ত্রুটি দূর্বলতা চিহ্নিত করে, তা কাটানোর লক্ষ্যে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। তেমনিই বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়েই নিজেদের আরো শাণিত করে পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কাউন্সিল সভা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯-২২ আগস্ট, ২০১৯ প্রায় ৭০ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে সারারাজ্য জুড়ে জেলাগুলিতে সিংহভাগ ব্লকেই সাংগঠনিক সফর করা হয়েছে যা অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষ করে প্রবীন

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কোন কোন মৃত্যু পাহাড়ের থেকেও ভারী

জ্যোতি প্রসাদ বসু
(প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

জ্যোতি কেমন আছ?
অপর প্রান্তের ল্যান্ডলাইন টেলিফোন থেকে ভেসে আসা জলদগম্ভীর কিন্তু পরম মমতা ও স্নেহ ভরা কুশল প্রশ্ন আর কোনদিন শুনতে পাবো না। এ বেদনা ভোলার নয়।

এ শুধু আমার অনুভূতি নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী দেহের প্রতি কোষে কোষে, যে অজয় দা নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য আপোসহীন সংগ্রামের বার্তা বহন করে বেড়িয়েছেন, সমগ্র অনুগামীদের জন্যই প্রতিনিয়ত ছিল তাঁর এমনই আন্তরিক কুশল জিজ্ঞাসা। কখনও সরাসরি, কখনো বা অন্যের মাধ্যমে। তাঁর সংস্পর্শে যারাই এসেছেন সকলেরই অনুভব এটাই। বৈজ্ঞানিক মতাদর্শগত সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালনার একজন প্রকৃত নেতার যে গুণ আবশ্যিক হওয়া উচিত, মানুষকে আপন করে নেওয়ার সেই মহৎ অথচ বিরল গুণ আমরা খুঁজে পাই অজয় দা'র মধ্যে। সহজ, সরল ব্যবহার, সাদা-সিধা পোষাক, আড়ম্বরহীন জীবন যাপন, হাসিমুখে কাছে টেনে নেওয়ার অভ্যাস সবাইকেই আকর্ষিত করতো।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি বলবার কে, কতটুকুই বা জানি। যাঁরা বলতে পারতেন, সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ আজ আর নেই। তাঁর মতো বর্ণময়, ঘটনাবহুল জীবন, বিশাল ব্যাপ্তী ও বিরাট মাপের মানুষকে ঠিক মতো চেনা, বোঝা বা পরিমাপের ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনটাই আমার নেই। অনেকটা সময় দুর থেকে ও একেবারে শেষদিকে সামান্য কয়েকটা বছর খুব কাছ থেকে অজয় দা'র সাথে পরিচিত হবার সুবাদে আমার সাদামাটা কিছু অনুভূতি কেবলমাত্র ভাগ করে নিতে পারি।

আমার সমিতি পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সুবাদে চাকুরি জীবনের গোড়া থেকেই অজয় দা'র সাথে আমার পরিচিতি। তখন তিনি ঐ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদকও বটে। এক ঘরোয়া বৈঠকে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন আবেগ, স্বতস্ফূর্ততার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের মতাদর্শগত ভিত্তি ও করণীয়। তখন কংগ্রেসী শাসন। সমগ্র কর্মচারীদের চাকুরি জীবন নানা নিয়ম কানুনের বেড়াজালে প্রতিনিয়ত সমস্যাসঙ্কুল। বিভাগগুলি স্থানীয় সমস্যায় জর্জরিত। সকলেই চায় ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ। কিন্তু ইউনিয়ন চাইলেই বা কি। সমস্যার সমাধান আর হয় না ক্ষোভ জমতে থাকে ইউনিয়নের উপর। আমি তখন কাজ করি পোদ্দার কোর্টে। রাইটার্সের বাইরের অফিসগুলিতে স্থানীয় সমস্যা তুলনামূলক বেশি। আমাদের ধারণা হলো রাইটার্সের বাইরের অফিস বলে আমাদের সমস্যা অবহেলিত। সভ্য, সম্মেলন সুযোগ পেলেই অভিযোগ করতাম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ভাষাও হয়তো বেসুরো হয়ে যেত কখনো সখনো। একদিন ডাক পড়লো অজয় দা'র কাছে। রাইটার্সের ৪ নং ব্লকের দোতলায় ছিল অজয় দা'র দপ্তর। দু একটা চেয়ার, টুল ছাড়াও সামনে পাতা থাকতো একটা বেঞ্চ। নানা প্রয়োজনে আসা নেতৃত্ব, কর্মীদের স্থান সঙ্কুলান হতো না তাতে। অপেক্ষা করতে হতো পাশে বা কখনো কখনো বাইরে দাঁড়িয়ে। তো আমার সুযোগ এল এক সময়। অজয় দা সব জানতেন আগে থেকেই। স্থানীয় সমস্যার প্রশ্নে বুঝিয়ে বললেন যে মৌলিক কারণ বা সমস্যাগুলির সমাধান না হলে বিভাগগত বা স্থানীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মূল সমস্যা ও স্থানীয় সমস্যার সম্পর্ক কোথায় ধৈর্য ধরে বোঝালেন অতি সাধারণ এক কর্মীকে। এক লহমায় খোরাক যুগিয়ে দিলেন চিন্তা চেতনার চর্চার।

বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ, রূপকথার মতো। সম্মোহিত করে স্থানুর মতো বসিয়ে রাখতেন অতুলনীয় কণ্ঠস্বর, প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়ভিত্তিক যুক্তি জাল, শব্দ চয়ন, ভাষার বিন্যাস ও বুননে। এই প্রসঙ্গে আমার কানে এখনও বাজে কেরালার রাজ্য কর্মচারীদের নেতা প্রয়াত ই পদ্মনাভন'এর উক্তি। ১৯৭৫ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৫ম সম্মেলন ছিল কলকাতার ত্যাগরাজ হ'লে। পদ্মনাভন ছিলেন প্রধান অতিথি। ফিরে যাবার সময় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবার ভার পড়েছিল আমার উপর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। তাঁর ইচ্ছা ছিল কলকাতার বিখ্যাত রসগোল্লা বাড়িতে নিয়ে যাবার। তা, সেদিন ছিল সারা রাজ্যে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট। যাবার পথে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন মিষ্টির দোকান খোলা পাওয়া গেল না। অগত্যা কে সি দাস'এর কৌটোর রসগোল্লার সাাথেই সমঝোতা করতে হয়েছিল। আমাদের সংগঠন সেসময় ছিল আক্রমণের মুখে। সে প্রসঙ্গেই কথা উঠতেই তিনি আমাকে বলেছিলেন "অরবিন্দ ঘোষের মতো সংগঠক ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের মতো বক্তা থাকতে তোমাদের চিন্তা কি?' দেশজুড়ে এমনই ছিল তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি।

দুই পক্ষের সমস্যা বা সহমতের অভাব ঘটলে পক্ষপাতহীন মধ্যস্থতায় ছিল অসাধারণ দক্ষতা। মূলত অর্থাভাবের কারণেই, বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে, বিশেষ করে শেষ দিকটায়, সরকারের কিছু কিছু সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত হতে সমস্যা দেখা দিলে, নীতিতে অবিচল থেকে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান

▶▶ সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

প্রসঙ্গ কাশ্মীর

নিরাপত্তা পরিষদ যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করে, বেশ কয়েকবার কাশ্মীর পরিদর্শন করে এবং অবধারিত ভাবে সেখানে গণভোটের সুপারিশ করে। ভারত চেয়েছিল রাষ্ট্র সংঘের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিতে, কিন্তু সংঘ গণভোটের সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে ভারত সরকারের বক্তব্য ছিল, কাশ্মীরের একটি অংশ যতদিন পাক সেনাবাহিনী দখল করে রাখবে ততদিন কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক উপায়ে গণভোট পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তার থেকে অনেক বেশি জরুরী পাকিস্তানকে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে, যেহেতু কাশ্মীরের জনগণই ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, সেহেতু কাশ্মীরের জনগণের মত এর মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে, সুতরাং গণভোটের আলাদা করে কোনো দরকার নেই, ভারত সরকারের নিজে থেকেই উচিত কাশ্মীর থেকে সরে দাঁড়ানো। অর্থাৎ তখন থেকেই দুই পড়শি দেশ কাশ্মীরকে নিয়ে কথার লড়াই চালিয়ে গেছে অথচ সেখানকার অধিবাসীদের প্রকৃত মনোভাব জানার পদ্ধতি সযত্নে নানা যুক্তিতে এড়িয়ে গেছে। আজও যখন ভারত সরকার এক তরফা ভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল করলো, তখনও সেখানকার বাসিন্দাদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কাশ্মীরবাসী অবমাননার শিকার আগেও ছিলেন এখনও সেটাই হলেন। মহারাজা যখন ভারতের সাথে সংযুক্তির প্রক্রিয়া নিয়েছিলেন, তখনও রাজ্যবাসীর ইচ্ছা জানার চেষ্টা করেননি, মাঝে ইন্দিরা গান্ধী যখন পাকিস্তানের সাথে কাশ্মীরকে নিয়ে সিমলা চুক্তি করেন, তখনও কাশ্মীরীদের মন বোঝার চেষ্টা করেননি, আর এখনকার সরকার তো মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী ছাড়া কারুর মতামতকেই গুরুত্ব দেয় না। ফলে সাধারণ কাশ্মীরবাসীর মনে ভারত কোনোদিনই দাগ কাটার অবস্থায় থাকেনি।

কাশ্মীরের সাথে ভারতের যোগসূত্র বলতে ওই ৩৭০ ধারা। যেহেতু গণভোটের শর্ত সাপেক্ষে 'অস্থায়ী' ভাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি হয়েছিল, সেহেতু যতদিন পর্যন্ত না সেখানকার মানুষের সুস্পষ্ট রায় জানা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্যেই এই ৩৭০ ধারার সৃষ্টি। ভারত ভুক্তির জন্যে যে চুক্তি ভারত সরকার আর হরি সিংয়ের মধ্যে হয়েছিল, তাতে স্পষ্ট ভাবেই লেখা ছিল সেই সার্বভৌমত্বের কথা। আবার এই চুক্তিও হয়েছিল যে আইনের বলে দেশ স্বাধীন হয়, সেই 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্ট ১৯৪৭' অনুযায়ী। সেখানে স্পষ্টতই লেখা ছিল যে, সেই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে যে কম-বেশি ৬০০ করদ রাজ্য আছে, তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন ভাবেই থাকতে পারে, অথবা ভারত কিম্বা পাকিস্তানের সাথে নিজেদের যুক্ত করে নিতে পারে। যদি তারা এই দুই দেশের কোনটির সাথে নিজেদের যুক্ত করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তা হতে হবে এক 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' বা এক নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রের মাধ্যমে। চুক্তির কোনও বয়ান সে আইনে দেওয়া ছিল না, কিন্তু এটা বলা ছিল যে চুক্তিপত্রে যা-ই লেখা থাক না কেন, অন্তর্ভুক্তির পর তার কোনওরকম বিচ্যুতি ঘটলে সংযুক্ত করদ রাজ্যগুলি যার যার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে, অর্থাৎ তারা মনে করলে স্বাধীন ভাবে রাজ্য চালাতে পারবে, অথবা নতুন কোনও দেশের সাথে নিজেদের যুক্ত করে নিতে পারবে। তখন আবার নতুন করে 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' তৈরি হবে। ভারত এবং পাকিস্তান, দুই দেশই এই আইন মেনে নিয়েছিল। সেই মোতাবেকই যতগুলো রাজ্য এই দুই দেশের সাথে যুক্ত হয়েছে, সবগুলোর সাথেই আলাদা 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ একুইজিশন' তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন বিশেষ সুবিধাও তারা ভোগ করছে সংবিধানের নানাধারা বা উপধারা অনুযায়ী। ভারতে এমন একাধিক রাজ্য আছে, যাদের অনেকেরই নিজস্ব সংবিধান আছে, নিজস্ব স্বাধীনতা দিবস আছে, আছে নিজস্ব পতাকা (সরকারী ভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা আর সেই রাজ্যের নিজস্ব পতাকা একসাথে ওড়ানো হয়), কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ ভাবেই আয়কর ছাড়ের আওতায় বিরাজ করে।

কাশ্মীরে যেহেতু সংযুক্তির প্রশ্নে গণভোট কোনওদিনই হয়নি, সেহেতু এখনও পর্যন্ত দেশের অঙ্গরাজ্য হিসেবে তার স্থান 'অস্থায়ী' এবং সে কারণেই সেখানকার অধিবাসীদের 'নাগরিক' (সিটিজেন) না বলে 'স্থায়ী বাসিন্দা' (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট) বলা হয় এবং সংবিধানের ৩৫ক ধারায় (আসলে এটি ৩৭০ ধারারই পরিপূরক) তাঁদের প্রত্যেককে সেই মর্মে শংসাপত্রও দেওয়া হয়। এই কারণেই এবং এই ধারা বলেই অন্য রাজ্যের কেউ সেখানে জমি কিনতে পারেন না অথবা সেখানকার কোনও মহিলা কাশ্মীরের বাইরের কাউকে বিবাহ করলে বিবাহ সূত্রে তাঁর অপত্তি তাঁর বংশধরদের ওপর বর্তাতে পারেন না। অবশ্য প্রথম বিষয়টি দেশের আরও কিছু জায়গার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু তার প্রেক্ষিত আলাদা।

হরি সিংয়ের সাথে চুক্তিপত্রে লেখাই ছিল, ''শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নীতিসমূহ নির্ধারণ করবে ভারতের সংসদ। এ ছাড়া আর সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হবে কাশ্মীরের আইন সভায়। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি নিজে (অর্থাৎ হরি সিং) সহমত হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তির কোনো কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না। ... ভবিষ্যতেও আমার সহমত্য ছাড়া কোনও কিছুর মাধ্যমেই আমায় কিছু করতে বাধ্য করা যাবে না।'' এই বক্তব্যের সাথে ভারত সরকার সেদিন সহমত হয়েছিল এবং দেশের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা (তৎকালীন ৩০৬ক নম্বর ধারা) হিসেবে এটি সংযোজিত হয়েছিল। তারপর থেকে এই বছরের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশের সব সরকারই এই চুক্তি মেনে কাজ করে এসেছে, কিন্তু চুক্তি বাতিলের কোনও পদক্ষেপ নেয়নি কারণ হরি সিং মারা যাওয়ার পর তাঁর 'সহমত্য' আদায় করার সুযোগ আর ভারত সরকারের ছিল না। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির পর সেখানে যে 'কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি' বা সংবিধান সভা গঠিত হয়েছিল, তার অধিকার ছিল এই ৩৭০ নম্বর ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা একে বাতিল করার। সভা একে অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষেই মত দেয়। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৭-র পর সেই সংবিধান সভা গুটিয়ে যাওয়ায় এখন আর একেবারেই সুযোগ নেই সরাসরি তাকে ব্যবহার করে ৩৭০ বাতিলের। এমতাবস্থায় গায়ের জোরে একে বাতিল করার অর্থ কাশ্মীরের সংযুক্তির চুক্তিকে লঙ্ঘন করা এবং সেটা হলে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্ট ১৯৪৭' (যা এখনও বলবত আছে) অনুযায়ী কাশ্মীরকে ফের স্বাধীন করে দেওয়া এবং নিজের ইচ্ছে মতো তাদের যে কোনও দেশের সাথে (পড়ুন পাকিস্তান) সংযুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া। এ কারণেই ১৯৬৯ সালে সম্পত প্রকাশ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারকের বেঞ্চ একে 'স্থায়ী চুক্তি' হিসেবে রায় দিয়েছিল। ২০১৮ সালেও এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট ফের সেই পুরনো রায়কেই বৈধতা দিয়েছে। বাস্তবে ৩৭০ ধারা কাশ্মীরে দেশের সংবিধানকে বলবত করার এক যোগসূত্র স্বরূপ। একে বারে বারে ব্যবহার করেই (প্রতি ক্ষেত্রেই হয় সেখানকার আইন সভার, অথবা আইন সভার অনুপস্থিতিতে সেখানকার রাজ্যপালের সহমত্যে) দেশের নানা আইন সেখানে বলবত করা হয়েছে। এ ভাবেই সংবিধানের ৩৯৫টি ধারার মধ্যে ২৬০টি এবং ১২টি তপসিলের মধ্যে ৭টি-ই সেখানে বলবত হয়েছে। অর্থাৎ এমনিতেই এখন দেশের সংবিধানের সাথে সেখানকার সংবিধানের বিশেষ কোনও ফারাক নেই। কিন্তু ৩৭০কে একেবারে বাতিল করা মানে সেই যোগসূত্রকেই ছিঁড়ে ফেলা, কাশ্মীরের যে তথাকথিত স্বাধীনতার কথা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বলে আসছিল, তার সপক্ষে পরোক্ষে ঘোষণা করা, দেশের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া (ইতোমধ্যেই নাগা স্টুডেন্ট ফ্রন্ট ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা মোদি সরকারকে সাধুবাদ জানিয়ে দেশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছে) এবং কাশ্মীরকে আগলে রাখতে গিয়ে যে সমস্ত বীর সৈনিক শহীদ হয়েছেন স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে, তাঁদের সবার আত্মবলিদানকে ব্যর্থ করে দেওয়া। এ অধিকার দেশের কোনও সরকারের নেই থাকতে পারে না। বিজেপি সেই অনধিকার কাজটাই গায়ের জোরে সম্পাদিত করলো গত ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে, বাতিল করে দিল দেশের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ধারা কাশ্মীরের মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে। রায় বাতিলের এই প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে, এখন দেখা যাক কোর্ট সেই মামলায় কি রায় দেয়, কিন্তু পুরো ঘটনায় বিজেপি-র ফ্যাসিবাদী চরিত্র যে আরও একবার প্রকাশ পেল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এমনিতেই আলপিন থেকে আলাদীন পর্যন্ত নিজেদের নখদর্পণে বলে যারা দাবি করে, বিজেপি-র সেই নেতারা এক তরফা ভাবে ৩৭০ ধারা বাতিলের অর্থ জানে না, এটা বিশ্বাস করা যায় না। তবু বরাবর তারা এই ধারা এক তরফা ভাবেই বাতিলের দাবি করে এসেছে, এমনকি গত লোকসভা নির্বাচনের আগে যে নির্বাচনী ইস্তাহার তারা প্রকাশ করেছিল, সেখানেও ক্ষমতায় ফিরলে এ ধারা বাতিলের কথা লেখা ছিল এবং ক্ষমতায় ফিরে সেটাই তারা করে দেখালো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটা করা হয়েছে বলে যে বিজেপি চেঁচিয়ে যাচ্ছে, সেই বিজেপি দেশের আর যে সব রাজ্য কাশ্মীরের মতোই বিশেষ সুযোগ ভোগ করে, সেগুলোর সম্পর্কে আশ্চর্যরকম নীরব কেন? তার চেয়েও বড়ো কথা, বিজেপি-র গুরুদেবেরা যে সংগঠনে আছেন, সেই আর এস এস শুরু থেকেই ৩৭০-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এলেও এর আগে বিজেপি-র কোনও সরকারই, এমনকি মোদি নেতৃত্বাধীন আগের সরকারও এই ধারা বাতিল করার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি, অথচ এখন হঠাৎ করেই সে কাজ করে ফেলা হলো কেন? হলো তার কারণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র কাশ্মীরই হচ্ছে মুসলিম প্রধান আর সেই মুসলিম প্রধান একটা রাজ্যের প্রতি কোনও কড়া পদক্ষেপ নিলে দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের ভাবাবেগ জাগ্রত হতে পারে আর সেই ভাবাবেগের আড়ালে চাপা দেওয়া যেতে পারে দেশের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার ইস্যু, কর্মহীনতার ইস্যু, বিদেশীদের কাছে দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার ইস্যু, সার্বিকভাবে অপদার্থতার ইস্যু। যে ভাবে দেশে এখন টাকার অবমূল্যায়ন ঘটছে, তা এক দীর্ঘস্থায়ী মন্দার ইঙ্গিতবাহী। বেকারি এক চরম জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, রাম মন্দির দিয়ে সে বেকারির জ্বালা কমানো যাচ্ছে না। সরকারী দপ্তরগুলিতে কোনও নিয়োগ নেই। একের পর এক বুনিয়াদি শিল্প হয় গুটিয়ে যাচ্ছে, নয় অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। মারুতি-সুজুকি গুরগাঁওয়ে তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, সদ্য পার্লে কোম্পানি ঘোষণা করেছে আগামী দিনে তাদের প্রায় দশ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা। বিক্রি হয়ে গেছে দেশের সব কয়লা খনি। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, বি এস এন এল-এর মতো সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বিক্রির আশংকায় দিন গুনছে। পাঠানকোট, বালাকোট ইত্যাদির ভাবাবেগকে নির্বাচনের আগে ব্যবহার করা হয়ে গিয়েছে, এখন আর সেগুলির কার্যকারিতা নেই। সুতরাং এমতাবস্থায় একটা নতুন ভাবাবেগ তৈরি করার রাস্তা বিজেপি-র খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন, নতুবা নিকট ভবিষ্যতে দেশে সার্বিক বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেতে পারে, আর সেই জন্যেই কাশ্মীরকে বলির পাঁঠা বানানো হলো, কাশ্মীরবাসীর কাছে খান খান করে দেওয়া হলো ভারত সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে, চুরমার করে দেওয়া হলো ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বোঝাপড়াকে।

কাশ্মীর এখন সর্ব অর্থেই গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। ভূস্বর্গের রাস্তায় এখন নাগরিকের আনাগোনা নেই, সেখানে এখন শুধু শোনা যায় মিলিটারির ভারি বুটের শব্দ। বাজার বন্ধ, ওষুধের দোকান বন্ধ, দপ্তর বন্ধ, বিদ্যালয় বন্ধ, বন্ধ সমস্তরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দী করে ফেলা হয়েছে সেখানে কোনোরকম কারণ ছাড়াই। এমনকি অসুস্থ মানুষের হাসপাতালে যাওয়ার পর্যন্ত উপায় সেখানে নেই। সর্বার্থেই গৃহবন্দী সেখানকার অধিবাসীরা কুটিল এক ভারত সরকারের বদান্যতায় বাধ্য হচ্ছেন বিনা চিকিৎসায়, বিনা অন্নে বাড়িতে মারা যেতে। নিজের প্রয়োজনে মরীয়া হয়েও কেউ রাস্তায় বেরলে তার জুটছেন কেবল ভিন্ন প্লেট গানের কয়েকঝাঁক গুলি। দেশ চালাতে নিজের অপদার্থতা আর অপরাধের থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে তাদের খেপিয়ে তোলার ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে আজ শ্মশান করে দেওয়া হল সুন্দর এক রাজ্য। মান আর হুঁশ থাকলে এ মানসিকতাকে মেনে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। হে পাঠক, যদি দেশকে ভালোবাসেন, যদি দেশের সংবিধানকে ভালোবাসেন, যদি আগামী দিনে নিজের দেশে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার দরকার আছে বলে মনে করেন, যদি মনে করেন মনুষ্য রূপধারী এক পাল সরীসৃপের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করা প্রয়োজন, তাহলে চুপ না থেকে গর্জে উঠুন ফ্যাসিবাদী, অসত্যভাষী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে, লড়ে যান দেশের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পেটের ভাত যোগাড় করতে। দেশের সব সৎ মানুষ আপনার সঙ্গে আছে। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য সম্মেলন

নেতৃত্বের উপস্থিতি দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে আমাদের। জেলায় বেশকিছু ব্লকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনকে সামনে রেখে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের দিনে দান-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সব ব্লক, মহকুমা, জেলা সদরের কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা ঐ দান-মেলায় অংশগ্রহণ করেন যা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস। একদিনে ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়, যা সংগঠনের প্রতি সর্বস্তরের কর্মচারীদের দায়বদ্ধতার উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ। সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে ব্লক, সেক্টর, মহকুমা, জেলা এবং কলকাতার ৭টি অঞ্চলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই বিপুল কর্মকাণ্ড সুসম্পন্ন করার জন্য তহবিল সংগ্রহের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা গর্বিত সংগঠনের অতীত ঐতিহ্যকে বহন করেই সারা রাজ্যজুড়েই কর্মচারীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা থেকে তহবিল সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন।

ইতিমধ্যেই ব্লক সম্মেলন শুরু হয়ে প্রায় অধিকাংশ ব্লকেই তা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের অভ্যন্তরে তা দারুণ সাড়া ফেলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে মহকুমা সম্মেলন। এবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা মহকুমা সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত থাকবেন। তারপর কলকাতার সেক্টরগুলির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। শেষে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে। এককথায় সারা রাজ্যজুড়ে কর্মচারীদের মধ্যে ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উত্তাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলির মধ্যে প্রজন্মগত রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া বিগত ৩টি রাজ্য সম্মেলন থেকে শুরু হয়েছে তার ধারাবাহিকতা এবারের সম্মেলনেও বজায় থাকবে। নবীন প্রজন্মকে যেমন নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, একইভাবে প্রবীণ নেতৃত্ব তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে অভিভাবকের মতো দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আজ যারা নবীন, ভবিষ্যতে তারা প্রবীণ হবেন। একই দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করার মধ্য দিয়ে তারা একটি চেতনাদৃপ্ত সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। নবীন ও প্রবীন শুধুমাত্র পরিপূরক বিকল্প নয়। নবীনের গতি, সৃজনশীলতা, সাহস, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ও মানসিকতার সাথে প্রবীণদের অতীতের বিশাল অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে সমন্বিত করেই বিগত দিনের সংগঠন মতাদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে মজবুত হয়েছে। যার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সংগঠন বর্তমান সময়ে পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে উঠতে পারবে।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব পুঁজিবাদের সব সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে যে লড়াই চলছে তা আরো তীব্র হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে নয়া উদারনীতির দাপট বাড়বে এবং আর এস এস -বি জে পি বেপরোয়া মানসিকতা নিয়ে আরো গতি বাড়িয়ে এই সংকটের বোঝা দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবে যা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে ছে। এবং মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে তারজন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি আরও বৃদ্ধি পাবে। তাদের শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করতেই তারা এই কাজ করবে। কাশ্মীরের ইস্যু যার জ্বলন্ত উদাহরণ। দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সহ মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে বামপন্থীরাই রাস্তাতে থাকবে। সেইজন্য সর্বত্র সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। তাই জটিলতর পরিস্থিতিতে আমাদেরও গণ আন্দোলন ও শ্রেণী আন্দোলনে যুক্ত থাকতে হবে। রাজ্যের প্রশাসনের অভ্যন্তরে ও বাইরে আমাদের লড়াই সংগ্রাম চলবে। আমাদের রাজ্যে বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে যেমন লড়াই চলবে, তেমনিভাবে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রশাসনের অভ্যন্তরে যাতে দাঁত ফোটাতে না পারে, তার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে ঐ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই জারি রাখতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান শক্তি হচ্ছে সদস্য সংখ্যা। বিগত প্রায় পাঁচ দশক ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির জন্য কর্মচারী সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত ৮ বছরে প্রায় ৩২ শতাংশ কর্মচারী কমেছে। কিন্তু কোনো নতুন নিয়োগ হয়নি। নিয়োগ যা হয়েছে তা মূলত চুক্তি ও এজেন্সি প্রথায়। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই আমরা যে দাবিগুলি নিয়ে লড়াই করছি তাতে মহার্ঘ ভাতা, পে-কমিশন প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনিই রাজ্যের যুবক-যুবতীদের স্বার্থে শূন্যপদ পূরণ ও বিশেষ করে চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবিও রয়েছে।

উল্লিখিত সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমাদের সংগঠনের ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন বর্ধমান জেলায় আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক জাতীয় ও রাজ্যের এক জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহকে চিহ্নিত করে সংগঠনের নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই এগিয়ে যাওয়ার দিশা নির্ধারণ করতে হবে। আশাকরি বিগত দিনগুলিতে সংগ্রাম আন্দোলনের ধারবাহিকতা ও তার সাফল্যের দিকগুলি চয়ন করে আগামী ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন সঠিক দিশা দেখানোর উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

কোন কোন মৃত্যু

বাতলাতে অজয় দা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মধ্যস্ততা করতে একবার ডাক পড়লো ত্রিপুরা থেকে। ৫ম কি ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতন স্কেল ও ভাতা চালু করার বিষয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ও সেখানকার সমন্বয় কমিটি কিছুতেই একমত হতে পারছে না। আমাকে ডাকলেন কাগজপত্র নিয়ে বুঝিয়ে দিতে। মূল বিষয়গুলি জানতেন। খুবই সামান্য সময়ে কেন্দ্রের ফরমুলা, আমাদের এখানে কি হয়েছে কি হয়নি সংক্ষেপে সেসব জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে চলে গেলেন ত্রিপুরা। আমি তো অবাক। মূল্য সূচক, মহার্ঘ ভাতার ভিত্তি, বেতন স্কেল নির্ধারণের ফরমূলা ইত্যাদি আঁক কষতে ও মেলাতে আমরা যারা এ সংক্রান্ত কাজের মধ্যে ছিলাম, তারাই হিমশিম খেতাম। অজয় দা দশ পনেরো মিনিটেই সব বুঝে গেলেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ফিরে আসার ও কি হলো জানতে। জানলাম অজয় দা মীমাংসা করে এসেছেন।

৭ম বামফ্রন্ট সরকারের সম্বর্ধনা। রাইটার্সের সামনে ছোট মঞ্চে আমাদের কেউ বসবে না এবং প্রয়োজনের বাইরে কেউ উঠবেও না এমনই সিদ্ধান্ত ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হলো। সামনে তিল ধারণের জায়গা নেই। সেই ভিড়ের মধ্যেই অজয় দা সহ অন্যান্য প্রবীণ নেতৃত্ব প্রখর রোদ্দুরের মধ্যে বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেখতে পেয়ে আমাকে ডেকে বললেন 'একি আমরা মঞ্চে, আর অজয় দা'র মতো বর্ষীয়ান নেতারা রোদের মধ্যে নিচে বসে আছেন'! আমি হ্যাঁ, না গোছের জবাব দিয়ে কোনমতে এড়িয়ে গেলাম। পরে মরমে মরে গেছি, ওরকম একটা সিদ্ধান্তের ভাগীদার হওয়ার জন্য। কিন্তু উপস্থিত সকলের থেকে বড় মাপের নেতা হয়েও অজয় দা'র কোন বিরক্তি দেখিনি। এ নিয়ে অভিমান বা অনুযোগও কোনদিন প্রকাশ পায়নি। এতবড় উদার মনের মানুষ ছিলেন।

আমি তখন সবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক। চরিত্রগত ভাবে আমি কিছুটা স্পষ্টবাদী। সে কারণে হয়তো আমি কিছু পরিমাণে বিরাগভাজন হয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন অজয় দা ডেকে পাঠালেন কিছু কথা আছে বলে। বড়ই উৎকণ্ঠা নিয়ে অজয় দা'র বাড়িতে হাজির হলাম। একথা সেকথার পর আসল প্রসঙ্গে গেলেন, আমার আচার আচরণ সম্পর্কে। জেলার বা সমিতির নেতৃত্বের সাথে কিভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। বুঝলাম অভিযোগ এসেছে। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম। বলার ভঙ্গিটা এতই সুন্দর ছিল যে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হতে পারিনি। সাংগঠনিক স্বার্থেই পিতৃতুল্য অভিভাবকের মতোই একান্তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্য কেউ হলে হয়তো একটু কোণঠাসা করার মনোভাব নিয়ে সাংগঠনিক স্তরে অভিযোগ তুলতেন।

সংগঠনের কোন কাজটা না করেননি? পোস্টার মারা, পোস্টার লেখা, প্রয়োজনে ঘর পরিষ্কার করা, কোন কাজেই তাঁর না ছিল না। প্রায় সব কাজই তিনি করেছেন কোন না কোন সময়ে। সম্মেলনের বা কর্মসূচীর ব্যাজের ডিজাইন করা ছিল বোধ হয় নেশার মতো। পরের দিকে অন্য যারা করতো তারাও অনেকাংশে অজয় দা'র উপর নির্ভরশীল ছিল। আর সব কাজই হওয়া চাই একেবারে নিখুঁত। নিজেও সব কাজে নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন না। মেমোরানডাম লিখতেন অপূর্ব। স্মারকলিপি লিখে তাঁকে দেখিয়ে নিলে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। বক্তব্য হবে দৃঢ়, কিন্তু ভাষা বা শব্দ চয়নে দায়িত্বশীল সংগঠনের মর্যাদা যেন ক্ষুন্ন না হয় সেটাই ছিল তাঁর শিক্ষা।

সেক্রেটারিয়েট সমিতির সম্মেলনের রিপোর্ট লেখা ছিল এক ইতিহাস। অজয় দা'র আমলে দেখেছি ১৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে, সমিতির দপ্তরে, মাদুরের উপর অন্যদের সাথে, অর্ধ শোয়া বা শুয়ে পড়ে দিনের পর দিন অজয় দা রিপোর্ট লিখে চলেছেন। সে সময় নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দপ্তরে প্রবেশাধিকার ছিল না। শুনেছি কোন কোন দিন বাড়ি ফেরা হতো না। নিচের হোটেলেই কোন মতে রাতের খাবার খেয়ে বা না খেয়েই সারা রাত ধরে রিপোর্ট লেখা চলেছে। কলেবর বড় হলেও সেক্রেটারিয়েট সমিতির সম্মেলনের রিপোর্ট অন্যান্যদের কাছে ছিল খুবই নির্ভরযোগ্য এক দলিল।

চারবারের সাংসদ, কিন্তু তা নিয়ে কোন অহংকার বা দেমাক ছিল না। লালবাতি দূরের কথা কোন গাড়িই ছিল না। সাংসদ এলাকায় গেলে প্রয়োজনেই ভাড়া গাড়ী ব্যবহার করতেন। আমাদের সংগঠনের থেকে ছোট এমন কোন কোন সংগঠনের নিজস্ব গাড়ি ছিল। সেকথা তুলে কখনো কেউ সংগঠনের নিজস্ব গাড়ি কেনার কথা বললে কোনদিন পাত্তাই দেননি। সাংসদ হিসাবে এলাকার উন্নয়নে নির্ধারিত কোটার অর্থ সবটাই যাতে ঠিকমতো ব্যবহৃত হয় সেদিকে ছিল তীক্ষ্ণ নজরদারী। টেলিফোন, গ্যাস ইত্যাদির সংযোগ পেতে আগে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হতো। সাংসদদের কিছু কোটা থাকতো। নিজের জন্য নয়, আমার এক বন্ধুর গ্যাসের কানেকশনের বিশেষ প্রয়োজনে অনেক দ্বিধা করে অজয় দা'র সাহায্য প্রার্থী হলাম। ক্ষমতার অপব্যবহার পছন্দ করতেন না। কাজটা সহজে হলো না। বললেন অপেক্ষা করতে হবে। আমার সাংসদ এলাকার ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন মিটিয়ে কোটা যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায় তবেই পাবে। প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য কয়েকটা কোটা। আমার ভাগ্যে শিঁকে ছিড়বে না মনে করেই ফিরে এলাম। বন্ধুকে সবটা বুঝিয়ে বললাম। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু অজয় দা ভোলেননি। অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠালেন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। সব তথ্য লিখে, সই সাবুদ করিয়ে একটা কুপন দিলেন। নিয়মকানুনের প্রতি এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন। সাংসদ হিসাবে বিভিন্ন কমিটির সদস্য হয়ে নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হতো। সরেজমিনে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে প্রকৃত তথ্য যাঁচাই করতে হতো। নিষ্ঠার সাথে সেসব দায়িত্ব পালন করেছেন। ফাঁকি শব্দ তাঁর অভিধানে ছিল না। যতটা পেরেছেন পরের উপকার করে গেছেন। কত মানুষ যে বিভিন্ন ভাবে অজয় দা'র কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন তার কোন হিসাব নেই, অজানাই। ঢাক ঢোল না পিটিয়েই সহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। কোনদিন এ ব্যাপারে নিজেকে জাহির করেননি। তা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আজকের দিনে যা বিরল।

শৃঙ্খলা ছিল শিক্ষনীয়। শেষের দিকে তো অজয় দা'র অনুজ সহকর্মীর মতো হয়ে গিয়েছিলাম। অনেকদিন সভা, সমাবেশ, সম্মেলনে নিয়মিত অজয় দা'র সাথী হয়েছি। কোনদিন সংগঠনের সভার কোন আলোচ্য বিষয়, আমার বা অন্যের দ্বিমত নিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে আলোচনা করেননি বা প্রসঙ্গই তোলেননি।

কোন সমস্যা নিজেরা মেটাতে না পারলে অজয় দা'র স্মরণাপন্ন হতে হতো। একবার ই এস আই ডাইরেক্টরেটে টিফিনের সময় ক্যারম খেলার জন্য কয়েকজন স্থানীয় কর্মী, নেতৃত্বকে সাসপেনন্ড করা হয়। অনেক অনুনয় বিনয় দুঃখ প্রকাশ করেও সেখানকার সর্বোচ্চ আধিকারিকে সাসপেনশন তুলতে রাজি করানো যাচ্ছিল না। গোঁ ধরে বসে ছিলেন। তিনি বিভাগ থেকে চলে যাবেন তবু আদেশ নড়চড় হবে না। রাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও বিফলে গেল। মন্ত্রীর কথাও শুনবেন না। হবে নাই বা কেন। বামফ্রন্ট সরকার, শ্রেণীগত কারণেই আমলাদের চক্ষুশূল। হাল আমলের সরকারের সাথে মেলাতে গেলে গোলক ধাঁধায় পড়তে হবে। বাম আমলে প্রতি পদে পদে বাধা এসেছে আমলাদের পক্ষ থেকে। আর এখন কান ধরে ওঠ বোস করানো বাকি আছে। এর চেয়ে বেশি কিছু না বলাই শ্রেয়। যাক সে কথা, সে আর এক ইতিহাস। রাষ্ট্রযন্ত্র কি তা বইতে পড়েছি। কংগ্রেসী আমলের আগে তো বাম সরকার ছিল না। তাই প্রাকটিক্যাল ক্লাসে মিলিয়ে দেখার সুযোগ ঘটেনি। হালে সে সুযোগ ঘটেছে। পুলিশ, আমলারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ। শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই তাদের ভূমিকা চিরকাল শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা ছিল সে সেই অবস্থান পাল্টানো। মূল কথায় ফিরে আসি। অজয় দা বিভাগের পূর্ণ মন্ত্রী প্রয়াত মহম্মদ আমিন সাহেবের কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন ও শেষপর্যন্ত সমস্যা মিটলো। সাসপেনশন আদেশ না তুলেই সেই আমলা বদলী হয়ে চলে গেলেন। তারপরে সাসপেনশন প্রত্যাহার হলো। ব্যতিক্রমও ছিল। নিজের কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন আমলাও ছিলেন। অপরপক্ষে, সবক্ষেত্রে আমলারাই যে দায়ী ছিলেন তা বললে সত্যের অপলাপ হবে। সংগঠন, আন্দোলনের প্রতি সেদিন আমিন সাহেবের ব্যতিক্রমী সহানুভূতি ও ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর দেখেছিলাম অজয় দা'র প্রতি তাঁর অপরিসীম সম্ভ্রম ও আস্থা।

খেতে খুব ভালবাসতেন শুনেছি। প্রথমদিকের কথা বলতে পারবো না। তখন খাবার জুটতোই বা কি। মুড়ি বা বড়জোর তার সাথে বাদামই সম্বল। তবে যাই খেতেন খুব তৃপ্তি করে খেতেন। পরের দিকে খাওয়া দাওয়ার উন্নতি যদিও বা ঘটলো, শারীরিক কারণেই তার পুরো সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার একটা আক্ষেপ বাকী জীবন বহন করে চলতে হবে। ১৯৯৬ সালে আমি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হলাম। পরিচিত পর্বের পর মঞ্চ থেকে নামছি। মাঝপথে অজয় দা'র সাথে দেখা। অজয় দা করমর্দন করে বললেন খাওয়াতে হবে। কথার কথা ভেবেই আমি তা মনে রাখিনি। অজয় দাও স্বাভাবিক ভাবেই সে প্রসঙ্গ কোনদিন তোলেননি। কিন্তু এখন মনটা মাঝে মাঝেই খচখচ করে।

একমাত্র অন্যের অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোন কারণে কোনদিন বিচলিত দেখিনি। বোলপুরে একটি সমিতির সম্মেলনের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হয়ে অজয় দা ও আমি আগের দিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ফেল করলাম। পরের দিন সকালে সম্মেলনের কি হবে সে ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না। এ তো লোকাল ট্রেন না যে পরের ট্রেন ধরে চলে যাব। অজয় দা দেখলাম বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। ঠিক মনে নেই পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়েছিল কি না। কোথা থেকে কি, হঠাৎ দেখি রেল কর্মচারীদের সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা হাজির। খাতির যত্ন করে বসিয়ে পরের একটা ট্রেনের টিকিট দিয়ে গেলেন। এমনই ছিল তাঁর সুনাম ও পরিচিতি।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম বা সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করতে যেতে হতো। তাঁদের অনেকেই অজয়বাবু কেমন আছেন জানতে চাইতেন। অজয় দা'র প্রতি তাঁদের ভক্তি, শ্রদ্ধায় আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হতাম। ডেপুটেশনগুলিতে দাম্ভিকতাহীন, ভদ্র ব্যবহার, বাচন ভঙ্গী ও কর্মচারীদের পক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত অকাট্য যুক্তির উপস্থাপনার জন্য অজয় দা অমালা মহলেরও সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন।

অসীম ধৈর্য ও বিচক্ষনতার সাথে যে কোন পরিস্থিতি সামলাতেন। জন্মলব্ধ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণের দক্ষতা, অসাধারণ দূরদর্শিতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ক্ষমতার গুণেই যে কোন কাজ বা দায়িত্বে সাফল্যের শীর্ষে অবস্থান করেছেন।

মন দিয়ে অপরের কথা ও মতামত শুনতেন ক্লান্তিহীন ভাবে। বিভিন্ন সমিতির নেতৃত্ব গঠন প্রক্রিয়া ও পে-কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন ছিল সংগঠনের কাছে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার মতো সমস্যাসঙ্কুল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতো যুক্তি, পাল্টা যুক্তি ও শেষকালে বাগবিতন্ডা। এই বিষয় দু'টিতে ঐকমত্যে পৌঁছাতে অজয় দা'র ভূমিকা ছিল অনন্য।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে অজয় মুখোপাধ্যায় সে অর্থে তাত্বিক নেতা ছিলেন না। আমার মনে হয় একেবারেই ভুল ধারণা। কথায় কথায় অপ্রয়োজনে কোটেশন বা তত্ত্বের বক্তব্যকে অকারণে জটিল ও দুর্বোধ্য করে তুলতেন না। তত্ত্ব ও প্রয়োগের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে পরিস্থিতির নিখুঁত বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণ করে দিতে তাঁর পারদর্শিতা অনুকরনীয়।

কর্মী, নেতৃত্ব ও কর্মচারীদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। 'কর্মচারীদের কাছে যাও, কর্মচারীদের কথা শোন', 'Lend your ears' এর মতো কর্মসূচী তো তাঁরই উদ্যোগে। কর্মীদের 'Tongue' বা জিভে কথা যুগিয়ে দিতে সভা সমাবেশের প্রধান আকর্ষণ তো ছিলেন তিনিই। মনে পড়ে ৬০-এর দশকের শেষদিকে সরকার পুলিশের জন্য রেশন চালু করলো। রাজ্য কর্মচারীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন ও দাবী উঠলো সরকারী কর্মচারীদের জন্যও রেশন চালু করতে হবে। অপরিণামদর্শী না হয়ে সংগঠন বিচক্ষণতার সাথে বোঝালো এরকম দাবী জনগণের ও কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদের দেওয়াল তুলে দেবে। আমাদের দাবী হলো সমস্ত মানুষের জন্য সস্তা দরে রেশন চাই। কর্মীরা প্রচারে নেমে পড়লো। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রচার হতে থাকলো সরকারী কর্মচারীরা রাজনৈতিক দলের বক্তব্য বলছে। দ্বিধান্বিত কর্মীদের অজয় দা পাল্টা জবাব যুগিয়ে দিলেন। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এটা সকলেরই কথাতেই মিলে যাবে।

কত সমিতি গড়ে তোলার কারিগর ছিলেন তিনি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ছাড়াও অন্যান্য বহু সমিতির সাথে শেষপর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছোট সমিতিগুলি বা অধিকাংশ সহযোগী সমিতিগুলি ছিল তাঁর উপর খুবই নির্ভরশীল। অন্তরের সাথেই তারা ভালবাসতেন অজয় দা'কে। অজয় দা ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তার পরেও যতদিন বেঁচে ছিলেন, বিভিন্ন সমিতির ছোট বড় যে কোন অনুষ্ঠান বা সম্মেলনে অজয় দা'কে একবার হাজিরা দিতেই হবে। অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেও অজয় দা সাধ্যমতো তাদের আবদার মিটিয়েছেন।

অজয় দা'কে রাগতে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। খুব বেশি হলে মুহূর্তের জন্য মুখটা একটু গম্ভীর হতো মাত্র। ব্যক্তিগত মতবিরোধ বাগ বিতন্ডা কোন সময়েই অসদ্ভাবের কারণ হয়নি, কখনো মনে রাখতেন না। এ এক অসাধারণ, অকল্পনীয় গুণ। কারও দুর্ব্যবহার, কটুক্তি, মিথ্যা অভিযোগ, দুর্নাম রটানো কোন কিছুই গায়ে মাখেননি। চরম প্রিয়জনকেও তাঁর নামে চরম অসত্য অভিযোগ আনতে দেখেছি। আশ্চর্য হয়ে দেখেছি কিছুক্ষণ পরেই সভা শেষে তার নাম ধরে ডেকে তার হাত ধরে হাসিমুখে চলে যেতে। কতটা উদার, সাংগঠনিক বোধে কতটা আত্মস্থ হলে মনুষ্যত্বের এতটা উচ্চতায় পৌঁছানো যায় তা কল্পনাতীত।

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট সমিতি ছিল তাঁর নিজের সমিতি। কিন্তু পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ রাখেননি। চরম ও সর্বপ্রথম আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী জেনেও প্রশাসনের নাড়ী নক্ষত্র ও হাঁড়ির খবর জানা সমিতিকে রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের মূল স্রোতের সাথে কেবলমাত্র খাতায় কলমে যুক্ত করা নয়, একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলার কঠিন সংগ্রামে তিনিই তো ছিলেন মূল কান্ডারী। সাময়িক অসুবিধা হলেও সামগ্রিক স্বার্থ ও ভবিষ্যতের ভাল'র জন্য প্রশাসনের তিনটি স্তরের বেতন স্কেল এক করা ও সেক্রেটারিয়েট ক্যাডার প্রথা চালু করারও প্রশ্নেও অজয় দা ছিলেন মেল বন্ধনকারী। সমস্তরকম সংকীর্ণতার উর্দ্ধে ছিলেন তিনি।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছিল তাঁর হৃদযন্ত্র আর সংগ্রাম আন্দোলনে ছিল ফুসফুসের মতো। রাজ্য কর্মাচরী তথা মেহনতী মানুষের ভালো মন্দর সাথে ওতপ্রোত ভাবে নিজেকে আমৃত্যু জড়িয়ে রেখেছিলেন। এক এক করে পুরানো সব নেতৃত্ব আগেই চলে গেছেন। বড় ভরসা ছিল অজয় দা আছেন। তিনিও চলে গেলেন। আমাদের কাছে তাঁর প্রয়াণ পাহাড়ের মতোই ভারী। একটা বিশাল অধ্যায়ের পরিসামপ্তি ঘটলো। কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়কে সহস্র প্রণাম, কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় লাল সেলাম। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

অমিত শাহর অর্থনীতি

উৎপাদনমুলক কাজ বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

স্বভাবতই, আবাসন শিল্প ও জমির ফাটকা কারবার পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করার পাশাপাশি, কাশ্মীরের অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও থাবা বসাবে। উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে ঐ উপত্যকা পরিণত হবে জমি মাফিয়া ও ফাটকা কারবারিদের মৃগয়া ক্ষেত্রে। যা নিশ্চিতভাবে অপরাধমূলক কার্যকলাপকে বৃদ্ধি করবে। অপরাধমূলক কার্যকলাপের বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বৃদ্ধি। আসলে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের সুযোগ নিয়ে এই দুই ধরনের বর্ধিত প্রবণতা একে অপরকে মদত দেবে। ঠিক যেমনভাবে অন্যত্র মাদক ও সন্ত্রাসবাদ একে অপরকে মদত দেয়।

যে রাজ্য সামন্তবাদ বিরোধী ভূমি সংস্কারের পথ দেখিয়েছিল দেশকে, সেই রাজ্যের এই পরিণতি দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু অমিত শাহের কাছে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির নাম 'উন্নয়ন'। □

অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্লক সম্মেলন

কলকাতার অঞ্চলগুলিতে সেক্টরের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। শারদোৎসবের অব্যবহিত পরেই নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলগুলির সম্মেলন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জেলা সম্মেলন প্রক্রিয়া শেষ হবে। সবশেষে ২৫-২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য সম্মেলন। একেবারে নিচের স্তর থেকে রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত এই যে দীর্ঘ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া তা শুধু আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়। গত তিন বছরে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে সংগঠন যে সমস্ত আন্দোলন সংগ্রাম ও সাংগঠনিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তার সাফল্য ও দুর্বলতাগুলিও আলোচিত হয় সর্বস্তরের সম্মেলনগুলিতে। এই সাংগঠনিক অডিট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংগঠনকে পরিস্থিতি উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং অনুগামী সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় সংগঠন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার ছ'দশকের পথ চলায় এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়েছে। □

সমিতির কর্মসূচী

গত ২৯ আগস্ট ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতার আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং-এ বিভাগীয় অধিকর্তার নিকট কেন্দ্রীয়ভাবে সাধারণ দাবি ও বিভাগীয় দাবি দাওয়া নিয়ে একটি ডেপুটেশন কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় জমায়েতের আহ্বান রাখা হয়েছিল। দেড়শতাধিক কর্মচারী ঐ জমায়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুরুতেই ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে একটি উদ্দীপ্ত মিছিল করা হয়। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির স্থায়ী সভাপতি প্রলয় সেনগুপ্ত ও অপর সহ-সভাপতি দীপক ব্যানার্জী। দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রণব ব্যানার্জী, যুগ্ম সম্পাদক। দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অতুন মিত্র। এই কর্মসূচীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চন্দন ঘোষ ও সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অশোক পাত্র। এরপর চারজনের একটি প্রতিনিধি দল বিভাগীয় অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দেন। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 4th Issue, August 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের

কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও গণডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ষষ্ঠ পে-কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ ও কার্যকর করার দাবিসহ মোট ১৪ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে লবণহ্রদের বৈশাখী মল-এর কাছে সমিতিগত কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সভা এবং গণডেপুটেশনের কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত হলো।

সভায় দাবি সংক্রান্ত মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক প্রতীক রায়চৌধুরী। অতঃপর দাবির স্বপক্ষে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব কর। তিনি তাঁর বক্তব্যের সূচনায় সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যায় বলেন, সারা দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে চলছে। এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা চূড়ান্তভাবে আর্থিক বঞ্চনার শিকার, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ৭ম বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছে—পাশাপাশি অধিকাংশ রাজ্যে নতুন বেতনক্রম চালু হলেও—আমাদের রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বয়স প্রায় ৫০ মাস হয়েছে অথচ অদ্যাবধি তার রিপোর্ট জমা পড়েনি। এনিয়ে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুধুমাত্র কিছু হেঁয়ালি তৈরি চলছে। একই সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট ক্যাডারে পদসঙ্কোচন, পদোন্নতির পরিসর সঙ্কোচন এবং ডেপুটেশন ও ডিটেইলমেন্টের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো প্রান্তে

প্রধান বক্তা অসিত ভট্টাচার্য

প্রতিহিংসামূলক বদলি চালু করা হয়েছে। লোকসেবা আয়োগের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হরণ করা হয়েছে এবং কর্মচারী নিযুক্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এছাড়াও ক্যাডার বহির্ভূত বিভিন্ন পদের সমস্যাগুলিকে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা জিইয়ে রাখছেন। ধর্মঘটসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আক্রান্ত, এরই পাশাপাশি রাজ্য তথা দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে ভাঙার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে কর্মচারী সমাজের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান রাখেন।

সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, শ্রমিক কর্মচারীদের বুনিয়াদি দাবিগুলি বামপন্থীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই অর্জিত হয়েছে। ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা মাসিক মজুরির দাবিতে লড়াইয়ে বামপন্থীরা, সকলকে ন্যূনতম ৬০০০ টাকা মাসিক পেনশন দিতে হবে এই দাবির লড়াইয়ে শামিল বামপন্থীরা।

শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক দাবিতে সরব সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা। সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করে। বর্তমান রাজ্য সরকার একদিকে বলে কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার টাকা নেই অথচ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বেতন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে আর টাকা খরচ করা হয় মেলা খেলা এবং ক্লাবগুলিকে সাহায্য প্রদানে। জনগণের সাথে মৈত্রী রচনা করে সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলনের পটভূমি রচনা করবে।

সভায় উপস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষই শেষ কথা বলেছে। সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব এই সময়ে বেশি। রাস্তায় নেমেই কর্মচারীদের দাবি আদায় করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে সমস্ত কর্মচারী সমাজকে শামিল করতে হবে দাবি আদায়ের লড়াইয়ে। সভার অন্তিম পর্বে সমিতির প্রস্তাবিত দাবিগুলি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এবং সভাপতি সুচেতা সাহার সমাপ্তি জ্ঞাপক ভাষণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীটি শেষ হয়। □

শতবর্ষের আলোকে ইস্টবেঙ্গল

১৯২০ সালের ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম। ক্লাব তৈরির প্রক্রিয়াটা চলছিল অনেক আগে থেকে। ক্লাব তৈরির প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল ১৮৯০ দিকে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। ওপার বাংলার মানুষদের ইস্টবেঙ্গল বলা হত। ওপার বাংলা থেকে মূলত দুধরনের লোকজন কলকাতায় আসতে একদল বিত্তশালী, প্রচুর জমিজমা টাকা পয়সা রয়েছে, তাঁরা আসতেন ব্যবসার তাগিদে, আর একদল তরুণ আসতেন পড়াশুনার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে আসা ছিন্নমূল মানুষদের মধ্যে অনেক বেশী জেদ, লড়াই করার মানসিকতা এবং সব হারানোদের ফিরে পাওয়ার জেদ ছিল অনেক বেশী।

১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাবের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়। দুই বাংলার মানুষ মিলেমিশে এক হয়ে যায়। গোটাদেশ বৃটিশদের হারানোর স্বাদ পায়। সেইদিন দুই বাংলা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেও সেই দলে ওপার বাংলর ৭জন ফুটবলার ছিলো। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের সেই ঐতিহাসিক শিল্ড বিজয়ের পরেও কলকাতা ফুটবলের প্রথম ডিভিশনের দরজা সকলের জন্য খোলা ছিল না। মোহনবাগান ও এরিয়ান প্রথম ডিভিশন ক্লাবের মর্যাদা উপভোগ করতো বাকি দল ছিল ইউরোপীয় বা মিলিটারি।

২৮ জুলাই ১৯২০ কোচবিহার কাপে মোহনবাগানের খেলা ছিল জোড়াবাগানের সঙ্গে। তখনকার দিনের তারকা হাফব্যাক জোড়াবাগানের শৈলেশ বসু। সেই খেলায় শৈলেশ বসুকে বাদ দিয়ে জোড়াবাগান দল গঠন করে। জোড়াবাগান ক্লাবের ভাসই প্রেসিডেন্ট সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী অনুরোধ করলেন তাকে খেলানোর জন্য। কিন্তু তার অনুরোধ কেউ কর্ণপাত করল না। রাগে, দুঃখে জোড়াবাগানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তিনি।

এরপরেই রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী, রমেশ চন্দ্র সেন, অরবিন্দ ঘোষ, শৈলেশ বসু এবং সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী মিলে তৈরী করলেন এক নতুন ক্লাব। ১ আগস্ট ১৯২০ প্রতিষ্ঠিত এই নতুন ক্লাবের নামকরণ হয় ইস্টবেঙ্গল। যেহেতু প্রতিষ্ঠাতারা পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল জার্সির রং হবে লাল-হলুদ।

জন্মের পরেই প্রথম টুর্নামেন্ট হারকিউলিস কাপে খেলতে নেমে চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। শৈলেশ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রায়বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায়ের। ক্লাব তৈরির খবরে তিনি মহাখুশি, পাশে দাঁড়ালেন ক্লাবের। সে সময় ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিস হত কুমোরটুলি মাঠে পরবর্তী সময় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান একই মাঠ ছিলো। (এখনকার মোহনবাগান মাঠ) প্লেয়াররা থাকতেন সুরেশ চৌধুরীর বাড়িতে। তড়িৎ ভূষণ রায়ের বাড়িতে সভা থেকে ক্লাবের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন সারদা রঞ্জন রায়। যুগ্ম-সম্পাদক হলেন সুরেশ চৌধুরী এবং তড়িৎ ভূষণ রায়।

১৯২৫ সালে দ্বিতীয় থেকে প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হয় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ মোটেই সহজে আসেনি। প্রবল লড়াই করেই প্রথম খেলার ছাড়পত্র পেতে হয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাব তাঁর আপন কৃতিত্বের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। দেশ বিদেশের কত ট্রফি জিতেছে। উপহার দিয়েছে গল্প করার মতো কত ঘটনা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষে অতীত এবং বর্তমান সময়ের সমস্ত খেলোয়াড়, ক্লাব কর্মকর্তা সহ অগণিত দেশ, বিদেশের সমর্থকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। □ **অভিজিৎ বোস**

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচী

বিগত ১৬ আগস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একগুচ্ছ দাবিতে বিধাননগরের প্রাণী সম্পদ ভবনে দপ্তর অধিকর্তা ফার্মাসিস্টদের সুস্থ নীতির ভিত্তিতে বদলী ও বাৎসরিক বদলীর তালিকা স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করা ইত্যাদি মোট ৭দফা দাবিতে ওইদিন দপ্তর অধিকর্তাকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও রূপায়ণ, কেন্দ্রীয়হারে বকেয়া ৪১ শতাংশ মহার্ঘভাতা, ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের পদোন্নতিসহ চলিত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে নতুন বেতনক্রম চালু করা, ফার্মাসিস্ট কাউন্সিল গঠন, প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, বিমান মাইতি, সিদ্ধার্থ নাথ, অনাদবন্ধু মণ্ডল, আব্দুল ছাকির। স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার আগে এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ই এম বাইপাসের মোড় থেকে মিছিল করে যান প্রাণীসম্পদ ভবন পর্যন্ত। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবেশ পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যা বন্দনা ভট্টাচার্য। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রাক্তন প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী আনিসুর রহমান, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ।

আনিসুর রহমান বলেন, রাজ্যে লুঠতরাজ চলছে দেদার। লাভজনক মেট্রো ডেয়ারি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতি বেশিদিন চলতে পারে না। তিনি সমিতির দাবিগুলির প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিজয় শংকর সিংহ বলেন, রাজ্য সরকারের সকল স্তরের কর্মচারীদের প্রতিই বর্তমান সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। বঞ্চনা চলছে সীমাহীন। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারকে রূপায়ণ করতেই হবে। এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

উল্লেখ্য, শিয়ালদহে রাজেন্দ্র ভবনে ঐদিনই ১৪তম ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত হয়। আলোচক ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী এবং প্রাক্তন প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী আনিসুর রহমান। □

বি এস এন এল-এর চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন সাত মাস বন্ধ। তাদের মাসিক কাজের দিন ২৬ থেকে কমিয়ে ২০ দিন করা হয়েছে। পাশাপাশি জিও, ভোডাফোন, এয়ারটেল প্রভৃতি বেসরকারী সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য বি এস এনএল-কে ৪জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে, বিশেষত বকেয়া বেতন প্রদান সাপেক্ষে নিয়মিত বেতন প্রদানের দাবিতে কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে টেলিফোন ভবনে মাসাধিককাল অনশন-অবস্থান কর্মসূচী করছেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা। এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে বি এস এন এল চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সবক'টি সংগঠন। সাত মাস বেতন বন্ধ থাকার ফলে আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়েছেন চার জন কর্মচারী। এছাড়াও অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন আরো একজন। বি এস এন এল-এর লড়াইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকেও এই লড়াইয়ের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানানো হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ এই অনশন অবস্থান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।